মুসলিম বিশ্বে
সাড়া জাগানো অমর গ্রন্থ

নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন

মূল : ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা
অনুবাদ : মাওলানা মাসউদুর রহমান

Contents

মুসলিম বিশ্বে সাড়া জাগানো অমরগ্রন্থ-

নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন

মূল আরবী: ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা
অনুবাদ: মাওলানা মাসউদুর রহমান

রাহনুমা প্রকাশনী™

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া কোন নেক কাজ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবিয়্যাত' এর তরজমা 'নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন' এর পাণ্ডুলিপি তৈরী থেকে শুরু করে ছাপা ও বাঁধাই শেষে পাঠকের হাতে পোঁছানো পর্যন্ত সব কাজ সম্ভব হয়েছে একমাত্র তাঁরই সাহায্যের বদৌলতে। দীর্ঘ সাধনার পাণ্ডুলিপি প্রকাশের আনন্দঘন মুহূর্তে স্বাভাবিকভাবেই কৃতজ্ঞতা জানানোর ইচ্ছা জাগছে অন্তরে। ভেবে অবাক হতে হয় কত ভয়াবহ আমাদের অক্ষমতা আর কত অসীম তাঁর দান! কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাটাও তাঁরই শেখানো। তাঁর সীমাহীন দান ও করুণার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায় তাঁরই শেখানো ভাষায় হৃদয়-মন উজাড় করে উচ্চারণ করছি 'আলহামদুলিল্লাহ'। 'ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ'।

ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশার অতি জনপ্রিয় তিনটি রচনা যথাক্রমে 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা', সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবিয়্যাত' এবং 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিত্তাবিঈন'। আল্লাহ তাআলার সীমাহীন মেহেরবানীতে আমি 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিত্তাবিঈন' এর অনুবাদ করি 'তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন' নামে। রাহনুমা প্রকাশনী ঢাকা থেকে আগস্ট '১১ জনসম্মুখে আসার পরপরই তার মুদ্রিত সকল কপিই হয়ে যায় নিঃশেষিত। সারাদেশ থেকে পাঠকদের অগণিত মোবাইল কলে আসতে থাকে অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা ও ড. পাশার

আরো লেখা বাংলায় অনুবাদের উপর্যুপরি অনুরোধ। আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। তাদের সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়ে হয়ে পড়ি বন্দী। সে কারণেই লেখকের দ্বিতীয় জনপ্রিয় রচনার অনুবাদ শুরু করি 'নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন' নামে। আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে সেটাই এখন তাদের খেদমতে তুলে ধরছি। আল্লাহর রহমতের ভরসায় আশা করছি প্রথম গ্রন্থটির মত তাদের কাছে এটাও হবে সমাদৃত ইনশাআল্লাহ।

নারী সাহাবী গ্রন্থে যে মহীয়সী নারীদের জীবন আলোচিত হল, তারা হলেন- প্রিয় নবীর দুধমা হালীমা, নবীজীর ফুফু ছফিয়্যাহ, প্রিয় নবীর কন্যা ফাতিমাতুয যাহরা, আবু বকর রাযি. এর কন্যা আসমা, নাসীবা আল মাযেনিয়্যা, আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবা, হযরত গুমাইছা ও উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না।

দুধমা হযরত হালীমার জীবনীতে প্রিয় নবীর মা স্বয়ং আমেনার জবানীতে দেখা যাবে গর্ভধারণ ও প্রসবকালীন সময়ে নবীজীর অলৌকিক ঘটনাবলী। মা হালীমার কাছে তাঁর শৈশবের, দুধপান সময়ের বিস্ময়কর ও বরকতময় ব্যাপারগুলো থেকে জানা যাবে ভবিষ্যত 'শ্রেষ্ঠনবীর' পূর্বাভাষ।

নবীজীর ফুফু ছফিয়্যার জীবনীতে দেখা যাবে নবী বংশের এক দু:সাহসী নারীকে। ইতিহাসের প্রথম মুসলিম নারী যিনি আক্রমণে উদ্যত এক মুশরিককে হত্যা করে নজির স্থাপন করেছিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের ভয়াবহ এক বিপদ থেকে হিফাজত করেছিলেন। ওহোদের রণাঙ্গনে সরাসরি অংশ নিয়ে ছিলেন। শহীদ ভাই হামযার বিকৃত লাশ দেখেও ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ছিলেন।

নবীকন্যা ফাতেমাতুয যাহরা পাঠ করলে পাওয়া যাবে নবীজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জান্নাতী নারীদের নেত্রী, জান্নাতী যুবকদের দুই সর্দার পুত্রের জননী আর এই

উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী ফাতিমার সরল ও সাধারণ জীবন প্রণালী, বিবাহ ও স্বামীগৃহে সমর্পণের সরলতা যদি আজকের পুরুষ ও নারীদের বিলাসিতায় একটুও লাগাম টেনে ধরত! আহা! তেমন যদি হত!

আবু বকর সিদ্দীকের কন্যা আসমা আর উম্মে 'উমারা, এই দুই নারী সাহাবীর কুরবানী আর ত্যাগ দেখে নির্ণয় করা মুশ্‌কিল যে, কার কোন ত্যাগটি বড়। আসমা রাযি. দৃষ্টিহীনা, স্বামী ও অবলম্বনহীনা নিজ পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইরকে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। পুত্র বলছেন- মা! আমি নিহত হওয়ার ভয় পাচ্ছি না, ভয় হচ্ছে ওরা আমার লাশকে বিকৃত করবে। এ কথা শুনে তিনি বললেন- বোকা ছেলে! নিহত হওয়ার পর কী হবে তাই নিয়ে ভাবছ? আরে বেটা! যবাইকৃত ছাগলের কি চামড়া ছোলার কষ্ট হয়? বিদায়ের মুহূর্তে পুত্র বলছে মা! তুমি আমার জন্য দুঃখ করো না। মা জবাব দিলেন- দুঃখ তো তখনই করতাম যখন তুমি অন্যায়ের পক্ষে নিহত হতে।

গুমাইছা বিনতে মিলহান ডাকনাম উম্মে সুলাইম, তিনি ছিলেন প্রিয় নবীর খালা। তাঁর জীবনীতে প্রকাশ পেয়েছে একজন আদর্শ স্ত্রীর করণীয় কর্তব্য। প্রিয়নবীর প্রতি ফুটে উঠেছে এক বিরল ভালবাসার ইতিহাস। তিনিই প্রকাশ করেছেন নবীজীর একটি বিশেষ মো'জেযাও।

পরবর্তী দুই নারী সাহাবী উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা। যারা দু'জনই হয়ে পড়ে ছিলেন চরম অসহায়া। সেই অসহায়ত্বই এক সময় তাঁদের সৌভাগ্যকে পৌঁছে দিয়েছিল যেন জমিন থেকে আসমানের বিশাল উচ্চতায়। প্রিয়নবী তাঁদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে চরম অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে ছিলেন। তাদেরকে দান করে ছিলেন সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার বিরল মর্যাদা। এ ধরণের বিগত যৌবনা, বিধবা মহিলাদের বিবাহের পেছনে না ছিল কোন জাগতিক উদ্দেশ্য, না ছিল

কোন কামনা-বাসনা।

মক্কার কাফের ও কুরাইশ সর্দার আবু সুফিয়ান- যিনি পরবর্তী জীবনে ইসলাম গ্রহণ করেন, তার অন্তররাজ্যে বিপ্লব ও পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল কন্যা উম্মে হাবীবার এই বিবাহ থেকেই। তার অন্তরে জ্বলে উঠেছিল এক জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা, দিন-রাত যে শত্রুর (মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধবংস আমি কামনা করেছি, যার জীবন অবসানের জন্য সারাক্ষণ ছোট্ট একটু সুযোগের অপেক্ষা করেছি, সেই শত্রুই আমার কন্যাকে চরম দুর্দিনে রক্ষা করলেন! বাবা হয়েও মেয়েকে যে সাহায্য আমি দিতে পারিনি, 'শত্রুকন্যাকেও' সে সাহায্য করতে তিনি পিছপা হননি। এমন মহান একজন মানুষের সঙ্গে সারাটা জীবন মিছেই শত্রুতা করে গেলাম যিনি কখনোই আমাকে শত্রু ভাবেননি। এভাবেই তার হৃদয়ের দুয়ার খুলে গেল। ইসলামের আলো সেখানে প্রবেশ করল।

প্রিয় পাঠক! অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি মূল আরবীর ভাষা ও ভাবকে পূর্ণরূপে লক্ষ্য রেখেছি। আরবীর সাহিত্যমান ও রস অনুবাদে পরিপূর্ণভাবে তুলে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি। প্রচেষ্টা চালিয়েছি নানাভাবে গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত রাখার। আমাদের আন্তরিকতা ও চেষ্টা সফল হল কিনা সে ফয়সালার ভার আপনাদের। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। পরিপূর্ণ এখলাছ নসীব করুন। আমাদের সকলের জন্য নাজাত ও মুক্তির একটু ব্যবস্থা করুন। আমীন।

বিনীত-

মাসউদুর রহমান

কমলাপুর, কুষ্টিয়া।

লেখকের দু'আ

হে আল্লাহ্! আমি তোমার প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামকে ভালবেসেছি, আমার হৃদয়ে সঞ্চিত সকল ভালবাসার মাঝে যা সর্বাধিক খাঁটি ও সর্বাধিক গভীর।

সুতরাং হে আল্লাহ! তুমি মহাত্রাসের দিনে (কেয়ামতের ময়দানে) দয়া করে তাদের কোন একজনের পাশে আমাকে একটুখানি স্থান করে দিয়ো।

কারণ, তুমি তো জানো আমি তাদের ভালবাসি শুধু তোমার জন্যই ইয়া আরহামার রাহিমীন!

—আবদুর রহমান

ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা রহ.

জন্ম - ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে।
জন্মস্থান – সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের 'আরীহা' শহর। সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষা 'হলব' শহরের খসরুবিয়া বিদ্যালয় থেকে। উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রী মিশর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উসূলুদ্দীন' (ধর্ম) অনুষদ থেকে। আরবী সাহিত্যে অনার্স, মাস্টার্স ও পি.এইচ.ডি. কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে।
কর্মজীবনের শুরু শিক্ষক হিসাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিরিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরবী ভাষার প্রধান পরিদর্শক (Inspector)। অতঃপর দামেস্কের 'দারুল কুতুব' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাশাপাশি দামেস্ক ইউনিভার্সিটির কলা অনুষদের প্রভাষক।
সৌদি আরবের ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। এখানে ইসলামী সাহিত্য কারিকুলাম এবং 'অলঙ্কার ও সমালোচনা' বিভাগের চেয়ারম্যান, 'মজলিসে ইল্‌মী'র (শিক্ষা পরিষদ) আজীবন সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনা পর্ষদ প্রধানের দায়িত্ব পালন।
মরহুম ড. আবদুর রহমান ইসলামী-সাহিত্য সৃষ্টির উদ্বোধক নন, বহু চিন্তাশীল, গবেষক তাঁর পূর্বেও এ কাজ করেছেন.... তবে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন পূর্বসূরীদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ও স্বার্থক রূপায়ন ঘটাতে। সাহিত্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই ফুটিয়ে তুলেছিলেন পরিপূর্ণ ইসলামী ভাবধারা।
তিনি সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর সভাপতিত্বে 'রাবেতা আল আদাবুল ইসলামী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সহ-সভাপতি। এছাড়াও বহু সংস্থা ও কমিটির তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সদস্য।
মৃত্যু ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই জুলাই শুক্রবারে তুর্কিস্তানের ইস্তাম্বুল শহরে। তাঁকে দাফন করা হয় সেখানেরই 'ফাতেহা' গোরস্তানে। যেখানে সমাহিত রয়েছেন অনেক সাহাবী ও তাবেঈ। জীবদ্দশায় যাদেরকে তিনি সর্বাধিক ভালবাসতেন এবং যাদের পাশে একটু স্থান পাওয়ার ব্যাকুল প্রার্থনা করতেন মহান প্রভুর দরবারে। আল্লাহ সেই প্রার্থনা কবুল করে পৃথিবীতেই তাঁর মৃতদেহকে স্থান দিয়েছেন মহান সাহাবী ও তাবেঈদের কবরের পাশে।
সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা চিরস্থায়ী জান্নাতেও তাঁকে তাঁদের সঙ্গী বানিয়ে দিন। আমীন।

অর্পণ–

ফাতেমা,

আয়েশা ও

আসমার

আম্মুকে।

হিদায়াতের আলো ঝলমল করে

উঠুক তার পূর্ণ জীবনে।

সূচিপত্র-

প্রিয়নবী এর দুধমা হালীমা সা'দিয়া

ব্যক্তিত্বসম্পন্না, রাশভারী এই মহীয়সী নারী প্রতিটি মুসলিমের কাছে সম্মানীয়া ... প্রত্যেক মুমিনেরই প্রিয়পাত্রী

কারণ, তাঁর পবিত্র স্তন থেকেই দুধপান করেছেন ভাগ্যবান শিশু মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তাঁর স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ বুকের ওপর ঘুমিয়েছেন ...

তাঁর মাতৃমমতা–উপচে–পড়া কোলে তিনি বেড়ে উঠেছেন

তিনি তাঁর ও কওম বানূ সা'আদের স্পষ্ট ও মিষ্টি ভাষা থেকে উপকৃত হয়েছেন

ফলে তিনি হয়েছিলেন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ স্পষ্টভাষী

ভাষা-অলঙ্কার ও বাগ্মিতায় সর্বোত্তম ব্যক্তি

তিনিই জগদ্বিখ্যাত মহীয়সী হালীমা সা'দিয়া, আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুধমা।

* * *

মুবারক শিশুটিকে– যে শিশু জগৎকে ভরপুর করে দিয়েছিল সদাচার ও করুণায় ...

পূর্ণ করেছিল মহত্ত্ব ও দিক নির্দেশনায়

সজ্জিত করেছিল নৈতিকতা ও মর্যাদার অলঙ্কারে

তাকে সা'আদ গোত্রীয় মহীয়সী হালীমার দুধপান করানোর পেছনে রয়েছে এক চমৎকার কাহিনী, যা তিনি তুলে ধরেছেন মনের মা'ধুরী মেশানো চিত্তাকর্ষক বর্ণনায়

উত্তম, উপাদেয় মমতা জড়ানো ভঙ্গিমায়

এসো, শুনি সেই কাহিনী

কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তো আকর্ষণীয়ই হবে

* * *

হযরত হালীমা সা'দিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ

আমি ও আমার স্বামী আমাদের শিশুপুত্রকে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হলাম দুধপানকারী কোন শিশুবাচ্চার খোঁজে, আমাদের সঙ্গে ছিল আমার কওম বানূ সা'আদের আরো অনেক মহিলা, যারা বেরিয়েছিলেন আমার মত একই উদ্দেশ্যে। সেটা ছিল এক খরাকবলিত দুর্ভিক্ষের বছরে

যা ধ্বংস করে দিয়েছিল ফসল

দুধশূন্য করে দিয়েছিল পশুর ওলান, সেই দুর্ভিক্ষ আমাদের কিছুই রাখল না অক্ষত। এলোমেলো করে দিল সব।

আমাদের ছিল বয়স পেরিয়ে যাওয়া শীর্ণ দুইটি উষ্ট্রী, যাদের থেকে পেতাম না এককাতরা দুধ। একটিতে চড়লাম আমি ও আমার ছোট্ট শিশু

আমার স্বামী চড়লেন অন্যটিতে। আমার উষ্ট্রীটি ছিল অধিক বয়স্কা এবং বেশি দুর্বল।

আল্লাহর কসম করে বলছি, সে সময় রাতে আমরা একমুহূর্তও ঘুমাতে পারতাম না তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমাদের শিশুপুত্রের বিরামহীন কান্নার কারণে। কেননা আমার বুকের সামান্য দুধে তার পেট ভরত না

আমাদের দুটি উষ্ট্রীর ওলানেও তাকে খাওয়ানোর মত কোন দুধ ছিল না

আমাদের শীর্ণকায় বাহনের ধীর ও মন্থর গতির কারণে আমরা কাফেলা থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম পিছে। সফরের সঙ্গীরা রুষ্ট ও বিরক্ত হচ্ছিলেন আমাদের প্রতি

আমাদের কারণে তাদের অবিরাম যাত্রা হয়ে যাচ্ছিল কষ্টকর।

আমরা পৌঁছে গেলাম মক্কায় এবং প্রত্যেকেই খুঁজতে লাগলাম দুগ্ধপোষ্য শিশু।

প্রত্যেক দাইয়ের কাছে পেশ করা হল শিশু মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহকে। বাদ দেয়া হল না কাউকেই। কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে রাজি হলাম না আমরা কেউই। কেননা সে এতিম-পিতৃহীন। আমরা মনে মনে ভাবছিলাম-

পিতৃহীন শিশুর মা কী দেবে আমাদের?!

কীইবা পাব আমরা তার দাদার কাছ থেকে?!

* * *

এরপর মাত্র দু'দিনের মধ্যেই আমার সকল সঙ্গিনী একটি করে দুধপানকারী শিশু যোগাড় করে ফেলল

কিন্তু আমার ভাগ্যে জুটল না কেউ

আমাদের বাড়ী ফেরার ভাবনা যখন চূড়ান্ত হয়ে গেল, আমি পড়ে গেলাম অভাবনীয় এক ভাবনায়। আমি বললাম আমার স্বামীকে- দেখ, এইভাবে কোন শিশু ছাড়া খালি হাতে ফিরে যাওয়া এবং চরম অভাব ও দারিদ্রের মধ্যে নিজেদের ঠেলে দেওয়া আমার ভাল লাগছে না। তাছাড়া আমার সঙ্গিনী প্রত্যেক মহিলাই একটি করে শিশু সঙ্গে নিয়ে ফিরছে। অতএব, আমি যাচ্ছি এতিম বাচ্চাটির কাছে, তাকে নিয়েই আমি ফিরব। স্বামী সমর্থন করে বললেন- কোন অসুবিধা নেই, যাও, তাকেই নিয়ে এসো, হয়ত এতেই আল্লাহ দান করবেন কল্যাণ ও বরকত। আমি গেলাম পিতৃহীন সেই শিশুর মায়ের কাছে এবং ফিরে আসলাম তাকে নিয়ে

আল্লাহর কসম! তাকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র আর কোন শিশু না পাওয়ার কারণেই নিলাম।

* * *

তাকে নিয়ে যখন ফিরলাম আমার কাফেলায়, তাকে বসালাম আমার কোলের মাঝে এবং তার মুখে পুরে দিলাম আমার স্তন, শূন্য ও দুধহীন সেই স্তন আল্লাহর ইচ্ছায় ভরপুর হয়ে উঠল

শিশুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হল

এরপর খেল তার ভাই এবং সেও হল পরিতৃপ্ত। অতঃপর তারা দু'জনেই ঘুমিয়ে গেল। আমি এবং আমার স্বামী শুয়ে পড়লাম ঘুমানোর উদ্দেশ্যে। কারণ কিছুদিন যাবৎ শিশুপুত্রের ক্ষুধাজনিত কান্নার কারণে আমাদের কপালে ঘুমের সৌভাগ্য জোটে খুব সামান্যই।

হঠাৎ আমার স্বামীর দৃষ্টি পড়ল আমাদের বয়স্কা ও শীর্ণকায় দু'টি উষ্ট্রীর প্রতি

দেখা গেল তাদের ওলান দু'টি স্ফীত ও দুধে ভরপুর হয়ে পড়েছে ...

তিনি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে এগিয়ে গেলেন, নিজের চোখ দু'টিকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি দুধ দোয়ালেন, পান করলেন।

আবার আমার জন্য দোয়ালেন, তার সঙ্গে আমিও পান করলাম। আমরা দু'জনেই তৃপ্ত ও পরিতৃপ্ত হলাম।

আমরা জীবনের সেরা সুখময় একটি রাত কাটালাম।

প্রভাতে আমার স্বামী ডেকে বললেন–

হালীমা! তুমি কি বুঝতে পেরেছ একটি মুবারক শিশু জুটে গেছে তোমার কপালে?

আমি তাকে বললাম–

তুমি একদম ঠিক বলেছ, আমার তো মনে হয়, আরো অনেক সুদিনেরই দেখা পাব এই ভাগ্যবান শিশুর মাধ্যমে।

* * *

এবার আমরা বাড়ী ফেরার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হলাম, আমি চড়লাম আমাদের সেই বুড়ী ও দুর্বল উটনীর পিঠে

শিশুটিকেও নিলাম আমারই সঙ্গে, দেখলাম সেই উষ্ট্রী চলছে এমন প্রফুল্ল গতিতে যে, কওমের সকল বাহনকে পিছে ফেলে সে হয়ে গেল অগ্রগামী। এমন কি কোন বাহনই আর আমাদের সঙ্গে তাল রাখতে পারল না।

আমার সঙ্গিনীরা বলতে লাগল ঃ

আরে ও আবূ যুআইবের মেয়ে! তুমি তো আমাদের অস্থির করে ছাড়লে, আমাদের কী সঙ্গে নেবে না!

এটাই কি সেই বুড়ী উটনী, আসার সময় যে সারা পথ আমাদের বিরক্ত করেছিল?

আল্লাহর কসম! সেটাই এটা।

তাহলে নিশ্চয়ই ওর কিছু হয়েছে।

* * *

আমরা সা'আদ গোত্রের ভূমিতে নিজেদের বাড়ী পৌঁছে গেলাম। জানি না আল্লাহর জমিনে এর চেয়ে মারাত্মক দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল আর আছে কি না। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, আমাদের মেষপাল প্রতিদিন সকালে খরাকবলিত চারণভূমিতে বেরিয়ে যেত, সারা বেলা চরে বেড়াত; আবার সন্ধ্যায় ফিরে আসত।

আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে আমরা ইচ্ছামত সেগুলো দোয়াতাম, প্রাণ ভরে পরিতৃপ্তির সাথে দুধপান করতাম। অথচ অন্যরা তাদের মেষ পাল থেকে এককফোঁটা দুধও দোয়াতে পারত না।

এর ফলে আমার কওমের লোকেরা নিজেদের রাখালদের বলতে শুরু করল– তোমরা করটা কি হ্যাঁ? হালীমার রাখালের সঙ্গে সঙ্গে থেকে মেষ চরাতে পার না?

নির্দেশমত রাখালেরা আমাদের মেষগুলোর আশপাশ দিয়েই চরাতে থাকল তাদের মেষপাল, তবে অবস্থার কোনই পরিবর্তন হল না, ক্ষুধার্তই থাকল তাদের মেষপাল। দিতে পারল না তাদের দুধের একটি ফোঁটাও

অথচ আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অব্যাহতভাবে বরকত ও কল্যাণ পেতেই থাকলাম। এমন সুখের মধ্যে এক এক করে ফুরিয়ে এল দুধ পান করানোর দু'বছর

তার দুধ ছাড়ানো হল

এই দুই বছরে শিশুটির শারীরিক-মানসিক বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটল এতই চমৎকারভাবে যা সাধারণত দেখাই যায় না

আমাদের কাছে তার অবস্থানের এখনো দু'বছর পূর্ণ হয়নি, ইতিমধ্যে সে পরিণত হয়েছে শক্ত ও প্রাণোচ্ছল একশিশুতে।

* * *

সেই সময়ে আমরা তাকে নিয়ে হাজির হলাম তার মায়ের কাছে, অথচ আমাদের তখন প্রচণ্ড ইচ্ছা তাকে কাছে রাখার, তীব্র কামনা আমাদের মাঝেই তাকে রেখে দেওয়ার, কারণ আমরা তার কারণে সৃষ্ট বরকত স্বচক্ষে দেখেছি।

যখন মুখোমুখি হলাম তাঁর মায়ের আমরা তার শিশু পুত্রের ব্যাপারে আশ্বস্ত করে বললাম, আরো একটু বড়, আরো কিছুটা শক্ত হওয়া পর্যন্ত কি ওকে আমার কাছে রাখলে হয় না

মক্কায় মহামারীর কারণে তার জন্য আমার ভয় হচ্ছে ...

এভাবে উদ্বুদ্ধ করতেই থাকলাম, অবশেষে তিনি রাজি হয়ে আবার তাকে আমাদের কাছে দিয়ে দিলেন

তাকে পেয়ে খুশিতে হাসতে হাসতে ফিরে এলাম

* * *

শিশুটি পুনরায় আমাদের নিকট আসার পর মাত্র কয়েকমাস যেতে না যেতেই ঘটে গেল এমন এক ঘটনা যা আমাদের করে তুলল আতঙ্কিত করে দিল অস্থির-পেরেশান।

আপাদমস্তক আমাদের নাড়িয়ে দিয়ে গেল।

এক সকালে আমাদের ছোট্ট ভেড়ার পাল চরাতে সে তার ভাইয়ের সাথে বেরিয়ে গেল। ছিল আমাদের বাড়ীর পিছনেই। সামান্য একটু পরেই তার ভাই ছুটতে ছুটতে এসে বলল–

'তোমরা ছুটে এসো, দেখো কুরাইশী ভাইয়ের কী হল, সাদা পোশাকের দু'টিলোক এসে তাকে মাটিতে শোয়ালো

তার বুক চিরে ফেলল

আমি ও আমার স্বামী এক দৌড়ে চলে গেলাম সেখানে, দেখলাম তার চেহারার রঙ ফ্যাকাশে, চোখে-মুখে ভীতির ছাপ

আমার স্বামী ব্যাকুল হয়ে তার পাশে বসে পড়ল। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম– তোমার কী হয়েছে বাবা?

সে বলল– সাদা জামা পরা দু'টিলোক এসে আমাকে শোয়ালো, আমার বুক চিরে কি যেন খুঁজল। কিছুক্ষণ পর ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। আমরা

চিন্তায় ব্যাকুল হলাম, অস্থির ও শঙ্কিত হয়ে তাকে নিয়ে ফিরে এলাম। যখন আমরা বাড়ী পৌঁছালাম, দেখলাম আমার স্বামীর দু'চোখে অশ্রুর প্লাবন, বেদনার্ত আওয়াজে তিনি বললেন-

আমার ভয় হচ্ছে আমাদের এখানে না জানি এই মুবারক শিশুটির এমন কোন বিপদ ঘটে যায় যা প্রতিরোধের ক্ষমতা আমাদের নেই ...

সে কারণেই আমি মনে করি তুমি তাকে পৌঁছে দিয়ে এসো তার পরিজনের কাছে। কারণ তারাই পারবে এ ধরণের যে কোন ব্যাপার সামাল দিতে।

* * *

ছেলেটিকে নিয়ে আমরা রওনা হলাম। মক্কায় পৌঁছার পর হাজির হলাম তার মায়ের কাছে, তিনি আমাদের দেখলেন, প্রথমে পুত্রের চেহারায় তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি বুলিয়ে সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করলেন। কী ব্যাপার হালীমা! এত আগ্রহ দেখিয়ে; এত আকাঙ্খার কথা বলে; যাকে চেয়ে নিয়ে গেলে আজ সেই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ফেরৎ দিতে দ্রুত চলে আসলে, কী হয়েছে!

আমি জবাব দিলাম, তার হাত-পা, হাড়-হাড্ডি মজবুত হয়ে গেছে ...

তাছাড়া তার অনন্যোপায় শৈশব কালও পূর্ণ হয়ে গেছে ...

আমার দায়িত্বের মেয়াদটাও প্রায় শেষ, আমি নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে নিরাপদ রাখার ইচ্ছায় তাকে আপনার নিকট ফেরৎ দিতে এসেছি ...

তিনি বললেন- সত্যি করে বল হালীমা! ওর ব্যাপারে তোমার আগ্রহ হারানোর আসল কারণ শুধু ঐটুকু নয়; যা তুমি বললে, বল, আর কী হয়েছে?

তিনি পীড়াপীড়ি করতেই থাকলেন এবং যতক্ষণ তাকে আসল ঘটনাটি না বললাম কিছুতেই ছাড়লেন না, সব কিছু শুনে তবেই তিনি শান্ত হলেন। আমাকে প্রশ্ন করলেন সরাসরি-

হালীমা! তার ওপর কি শয়তানী প্রভাবের আশঙ্কা হচ্ছে তোমার?

হ্যাঁ, আমি উত্তর দিলাম।

তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন–
কখনোই সম্ভব নয়, আল্লাহর কসম! শয়তান কোনভাবেই তার কাছে ঘেঁষতে পারবে না
আমার এই পুত্রের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ... তুমি কি সেটা জানতে চাও?
আমি বললাম– অবশ্যই জানতে চাই ...
তিনি বললেন–
সে যখন আমার পেটে আসে তখন দেখলাম আমার শরীর থেকে একটি নূর বের হল যার আলোকচ্ছটায় আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম সুদূর সিরিয়ার 'বুছরার মহল'
তাছাড়া যখন তাকে প্রসব করি সে ভূমিষ্ঠ হয় দুই হাত মাটিতে ঠেকিয়ে, আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে
এরপর তিনি বললেন–
সে যাই হোক, তুমি যখন নিয়ে এসেছ ওকে রেখেই যাও আমার কাছে। আমাদের সকলের বিশেষত ওর পক্ষ থেকে তোমাকে 'জাযা-কাল্লা-হু খায়রান' (আল্লাহ তোমাকে এরজন্য সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন।)
আমি ও আমার স্বামী সেখান থেকে বের হলাম ব্যথিত, চিন্তিত ও বিষণ্ন হৃদয়ে। তার এই বিচ্ছেদ ব্যথা ছিল আমাদের জন্য ভীষণ ভয়াবহ
এই বিচ্ছেদ ব্যথার কষ্টকর প্রভাব একটুও কম ছিল না আমাদের শিশু পুত্রের মনের উপর। সেও ছিল সাথী হারানোর বেদনায় আমাদেরই মত বেদনার্ত ও চিন্তাক্লিষ্ট।

* * *

অবশেষে, হালীমা সা'দিয়া বেঁচে ছিলেন দীর্ঘকাল পর্যন্ত; এমন কি বার্ধ্যক্যেরও সীমা পেরিয়েছিলেন
নিজের জীবনে নিজের চোখেই তিনি দেখতে পেলেন পিতৃহীন সেই শিশু–যাকে তিনি একদা দুধপান করিয়েছিলেন, সে হয়েছে আরবজাতির অবিসংবাদিত নেতা
ইনসানিয়্যাতের রাহবার–দিশারী আর মানবতার নবী

তিনি ঈমান আনলেন তাঁর প্রতি, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব কুরআনকে মেনে নিয়ে একদিন নিজেই হাজির হলেন তাঁর সম্মুখে
যেইমাত্র তিনি দেখলেন তাঁকে (হালীমাকে), আনন্দে হয়ে গেলেন আত্মহারা, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বলতে লাগলেন–
উম্মী উম্মী (আমার মা, ও আমার মা)
তিনি খুলে ফেললেন নিজের গায়ের চাদর, বিছিয়ে দিলেন তাঁর বসার জন্য, চূড়ান্ত সম্মান ও মর্যাদার প্রকাশ ঘটালেন তাঁর জন্যে, তাঁর আগমনের কারণে প্রকাশ করলেন চূড়ান্ত আনন্দ ও খুশি।
উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন তাঁদের দু'জনের দিকে, যে দৃষ্টিতে ছিল রাজ্যের সমীহ আর ভীষণ ঈর্ষা

* * *

ওফাদার ও বিশ্বস্ত, সদাচারী ও সদ্ব্যবহারের শোকরগুযার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি করুণাময়ের সীমাহীন করুণা বর্ষিত হোক
তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র মাধুরীতে সুসজ্জিত
হালীমা সা'দিয়ার প্রতি বর্ষিত হোক মহান আল্লাহর প্রীতি ও সন্তোষ
তিনি ছিলেন মহানবীর মমতাময়ী দুধমা।

ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব

'ছফিয়্যাই প্রথম মুসলিম মহিলা, যিনি একজন মুশরিককে হত্যা করেছিলেন আল্লাহর দীন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে।'– ঐতিহাসিকদের মত

কে এই সেরা বুদ্ধিমতি নারী, পুরুষরা যার কারণে হাজার রকম হিসাব-নিকাশ করতে বাধ্য হত?
কে এই নির্ভীক সাহাবিয়া যিনি ছিলেন সর্বপ্রথম এক মুশরিক হত্যাকারিণীর গৌরবে ভূষিত?
কে এই বিচক্ষণ মহিলা যিনি সৃষ্টি করেন আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম তরবারি খাপমুক্তকারীর ইতিহাস?
তিনিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা ছফিয়্যাহ হাশেমী ও কুরাইশী।

* * *

চতুর্মুখী মর্যাদা ও গৌরব ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিবকে বেষ্টন করে রেখেছিল। তাঁর পিতা– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ছিলেন কুরাইশের অবিসংবাদিত নেতা।
তাঁর মা– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা. আমেনা বিনতে ওহাবের বোন হালা বিনতে ওহাব।
তাঁর প্রথম স্বামী– হারেস ইবনে হারব ছিলেন উমাইয়া গোত্রের প্রধান আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এর সহোদর ভাই।
প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় স্বামী– আল'আউওয়াম ইবনে খুওয়াইলেদ, যিনি ছিলেন (জাহেলী যুগে আরব নারীদের নেত্রী এবং ইসলামী যুগে প্রথম উম্মুল মু'মিনীন) খাদীজা বিনতে খুওয়াইলেদ'র

ভাই।

তাঁর পুত্র– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেহরক্ষী যুবায়ের ইবনুল 'আউওয়াম।

এতো মর্যাদা ও গৌরবের পর কি আর কিছু থাকতে পারে যার প্রতি অন্তরের বাসনা জাগবে?

* * *

তাঁর স্বামী 'আউওয়াম ইবনে খুওয়াইলেদ মারা গেলেন, তার জন্য রেখে গেলেন একটি ছোট্টশিশু। সেই শিশুপুত্র 'যুবায়ের'কে তিনি লালন-পালন করলেন কঠোরতা ও কষ্টের মধ্যে রেখে

তাকে অভ্যস্ত করে তোলেন অশ্বারোহন আর যোদ্ধার জীবনে

তার খেলা ও খেলনার কৌতূহলকে তিনি চালিত করেছিলেন তীর, ধনুক আর বর্শার দিকে

তিনি তাকে ঠেলে দিতেন সকল ভীতির দিকে

পাঠাতেন সব ঝুঁকির মুখে

যখনই দেখতেন ভয়ে পিছপা হল অথবা দ্বিধা করল, তাকে ভীষণ প্রহার করতেন, যে কারণে তাকে অভিযুক্ত করে পুত্রের চাচারা বলতেন–

'এটা তো ক্রুদ্ধ মানুষের প্রহার, মমতা মেশানো মায়ের শাসন এটা নয়।'

তিনি এর তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করে বলতেন–

مَنْ قَالَ قَدْ أَبْغَضْتُه فَقَدْ كَذَبْ - و إنمَا أضْرِبُه لِكَيْ يَلِبْ
و يهْزِمُ الجَيْشَ و يَأْتِيْ بالسلبْ

যে বলে তাকে প্রহার করে রাগ ঝেড়েছি, মিথ্যা বলে
আলসেমি ছেড়ে হবে সে বিচক্ষণ, করেছি তাই মায়ের শাসন
শত্রুকে হারাবে, লুণ্ঠিত মাল ফিরিয়ে আনবে আপনার বাহুবলে।

* * *

যখন মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে চিরসত্য আর হিদায়াতের দীন দিয়ে পাঠালেন মানুষের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতারূপে, আর নির্দেশ

দিলেন নিজের নিকটাত্মীয়দের মাধ্যমেই দায়িত্বের সূচনা করতে, তখন তিনি আব্দুল মুত্তালিবের সকল সন্তানকে, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলকে একত্রিত করলেন। বললেন–

'হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! হে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা ছফিয়্যাহ! ওহে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা! যদি তোমাদের ওপর আযাব এসে পড়ে তবে তা ঠেকানোর কোন ক্ষমতাই আমার নেই। তোমাদের কোন উপকারই আমি করতে পারব না।'

তাদেরকে আহ্বান করলেন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের, উৎসাহ দিলেন তাঁর রিসালাতকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে

তাদের মধ্য থেকে কিছু মানুষ এগিয়ে এলেন স্নিগ্ধ আলোর প্রতি, কবুল করে নিলেন সত্য দীন ইসলামকে। কেউ কেউ আবার সেই আলোকে প্রত্যাখ্যান করে রয়ে গেল মিথ্যার অন্ধকারে। ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মুমিনদের প্রথম কাতারে ঠিক তখনই ষোলকলায় পূর্ণ হল ছফিয়্যাহকে বেষ্টন করে রাখা গৌরব ও মর্যাদার সকল দিক। বংশের নেতৃত্ব আর ইসলামের অনন্য মর্যাদা।

* * *

ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব তাঁর তরুণ পুত্রকে নিয়ে শামিল হলেন ইসলামের আলোর মিছিলে। ফলে তাদেরকেও ভোগ করতে হল কুরাইশের চাপানো নির্যাতন, দুর্ভোগ আর বাড়াবাড়ির কষ্ট, যা সহ্য করেছিলেন প্রাথমিক ও অগ্রগামী সকল মুসলিম।

ফলে আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর নবীকে এবং তাঁর সঙ্গী মুমিনদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন, এই মহীয়সী হাশেমী নারী মক্কায় নিজের বহুমুখী গৌরব ও সুকীর্তির সকল স্মৃতি ফেলে রওনা হলেন মদীনার অভিমুখে, আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দীন রক্ষার স্বার্থে হিজরত করলেন মদীনায়।

* * *

বিশেষ ব্যাপার এই যে, তখন এই মহীয়সী অতিক্রম করছিলেন দীর্ঘ পোড় খাওয়া জীবনের প্রায় ষাট বছর।

জিহাদের বিভিন্ন ময়দানে তাঁর রয়েছে এমন কিছু অবস্থান, ইতিহাস যার আলোচনা আজও অব্যাহত রেখেছে প্রশংসা ও মুগ্ধতায় পঞ্চমুখ হয়ে। এখানে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে মনে করি সে রকম দু'টি অবস্থানের আলোচনাই যথেষ্ট।

একটি ছিল ওহোদের যুদ্ধে

অন্যটি খন্দকের যুদ্ধে

* * *

যে অবস্থান ছিলো ওহোদের প্রান্তরে তা হলো, তিনি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উদ্দেশ্যে ছোট্ট একটি মহিলা দল নিয়ে বের হলেন মুসলিম সৈনিকদের সঙ্গে।

সেখানে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন পানির ব্যবস্থাপনায়, তৃষ্ণার্ত মুজাহিদদের পানি পান করিয়ে তৃপ্ত ও উজ্জীবিত করলেন, তীর চেঁছে তীক্ষ্ম করলেন, ত্রুটিপূর্ণ ধনুক মেরামত করলেন।

তা ছাড়া তাঁর ছিল আরো একটি উদ্দেশ্য, সেটা হল যুদ্ধ ও যুদ্ধক্ষেত্রকে নিজের সবটুকু আবেগ-অনুভূতি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা

বিচিত্র নয়, কারণ সেখানে সেই যুদ্ধের প্রান্তরে ছিলেন তাঁরই মৃত ভাইয়ের পুত্র আল্লাহর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ছিলেন তাঁর ভাই 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ) হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব

ছিলেন তাঁর পুত্র যুবাইর ইবনুল আউয়াম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহরক্ষী

তাছাড়া সবকিছুর উর্ধ্বে ছিল এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হবে ইসলামের ভাগ্য, যাকে তিনি আলিঙ্গন করেছেন চরম ভালবেসে

যার ভালবাসা বুকে নিয়ে হিজরত করেছেন প্রতিদানের প্রত্যাশায়

যার মধ্য দিয়ে দেখতে পেয়েছেন জান্নাতের প্রশস্ত রাজপথ।

* * *

তিনি যখন দেখতে পেলেন মুসলিম বাহিনীর অল্পক'জন ছাড়া সকলেই বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফেলে

এবং দেখতে পেলেন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি এবং প্রায় তাঁর উপর আক্রমণে উদ্যত তখন তিনি হাতের পানির পাত্রটি ছুঁড়ে ফেললেন জমিনের ওপর আর আক্রান্ত শাবকের মা সিংহীর মত লাফিয়ে উঠলেন, ছিনিয়ে নিলেন এক পরাজিত সৈনিকের বর্শা, তা দিয়ে সৈনিকদের সারি ভেদ করতে করতে ছুটে চললেন, বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে এদিক ওদিক আঘাত করলেন, মুসলিম সৈনিকদের লক্ষ্য করে গর্জে উঠলেন–

আরে ও কাপুরুষের দল! আল্লাহর রাসূলকে ফেলে পালাতে চাও! নিজেদের জান বাঁচাতে চাও! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখলেন, তাঁর আশঙ্কা হল যে, তিনি (ছফিয়্যাহ) তাঁর নিহত ভাই হামযার লাশ দেখে ফেলবেন, মুশরিক বাহিনী যার বিকৃতি ঘটিয়েছে অত্যন্ত কুৎসিত রূপে। তাঁর পুত্র যুবাইর কে বললেন–

–মাকে ফেরাও যুবাইর, তাড়াতাড়ি

যুবাইর সেদিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন–

–মা, থামো, মা, এদিকে এসো।

–সরে যা, খবরদার মা মা করবি না।

–আল্লাহর রাসূল ঐদিকে যেতে নিষেধ করছেন।

–কিন্তু কেন? আমি তো জানি আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করা হয়েছে। তার এ কুরবানি আল্লাহর জন্য

একথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইরকে বললেন–

–যেতে দাও।

যুবাইর তার পথ ছেড়ে দিলেন।

* * *

যুদ্ধ যখন শেষ হল, ছফিয়্যাহ তাঁর ভাই হামযার লাশের কাছে গেলেন, দেখলেন তাঁর পেট ফেড়ে কলিজা বের করা হয়েছে, নাক ও কান কেটে ফেলা হয়েছে, চেহারা বিকৃত করা হয়েছে। তিনি তাঁর জন্য মাগফেরাতের দু'আ করলেন। বলতে থাকলেন–

এসবই আল্লাহর দীনের খাতিরে হয়েছে।

আমার কোন অসন্তুষ্টি নেই। আল্লাহর ফয়সালায় আমি তুষ্ট। সম্পূর্ণ সমর্পিত।

আল্লাহর কসম! আমি ছবর করব। আমি মনে করব আমার এ বিপদ আল্লাহর দীনের জন্য এবং সে কারণে এর পূর্ণ প্রতিদান অবশ্যই পাব ইনশাআল্লাহ।

* * *

এটা ছিল ওহোদের ময়দানে ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের অবস্থান

খন্দকের যুদ্ধে তার অবস্থান, সে তে. বীরত্বগাঁথা এক রুদ্ধশ্বাস কাহিনী, যার পরতে পরতে তাঁর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা প্রস্ফুটিত, সাহসিকতা ও সংকল্প প্রকাশিত

তাহলে চলো কান পেতে শুনি ইতিহাসের সেই বিখ্যাত কাহিনী।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলে নারী ও শিশুদেরকে সুরক্ষিত দুর্গে রেখে যাওয়া ছিল তাঁর অভ্যাস। কেননা প্রহরীদের অবর্তমানে কোন বিশ্বাসঘাতক মদীনার ওপর আক্রমণ করে বসতে পারে

খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন ঘনিয়ে এল। তিনি নিজের স্ত্রীদের, ফুফুদের এবং একদল মুসলিম স্ত্রীদেরকে রেখে গেলেন হাস্‌সান ইবনে সাবিতের মীরাস সূত্রে প্রাপ্ত দুর্গে, এটিই ছিল মদীনার সর্বাধিক সুরক্ষিত দুর্গ।

মুসলিমগণ যখন খন্দকের আশপাশে কুরাইশ ও তার মিত্রদের মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করছিলেন, নারী ও শিশুদের ওপর শত্রুর আক্রমণ নিয়ে

ভাবার সুযোগ যখন তাদের ছিল না। ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব তখন ফজরের অন্ধকারে একটি ছায়ামূর্তির নড়াচড়া দেখতে পেলেন, কান পেতে সেদিকে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলেন

হঠাৎ তিনি দেখলেন এক ইহুদী দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে, দুর্গের চারপাশে ইতিউতি দৃষ্টি ফেরাচ্ছে, আড়িপেতে জানতে চাচ্ছে কারা রয়েছে এর ভেতরে।

তিনি বুঝে ফেললেন নিশ্চয়ই লোকটি তার কওমেরই কোন গুপ্তচর। জানতে এসেছে এখানে আক্রমণ প্রতিরোধকারী পুরুষ মানুষ আছে; না শুধুই নারী আর শিশু অবস্থান করছে।

তিনি মনে মনে ভাবলেন– বনী কুরাইযার ইহুদীরা-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভেঙে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশ ও মিত্রদের সাহায্য করেছে।

আর এ মুহূর্তে আমাদের উপর ওরা কোন আক্রমণ করলে তা ঠেকানোর জন্য কোন একজন মুসলিম পুরুষ আমাদের পাশে নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীরা রয়েছেন শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি অবস্থানে

এ অবস্থায় আল্লাহর ঐ দুশমন যদি আমাদের প্রকৃত পরিস্থিতির খবর কওমের কাছে পৌঁছাতে সফল হয়, তাহলে ইহুদীরা নারীদেরকে করবে বন্দী আর শিশুদের বানাবে দাস-দাসী, সেটা হবে মুসলিমদের জন্য এক ভয়াবহ বিপদ ও বিপর্যয়ের কারণ।

* * *

এসব ভেবে তিনি নিজের ওড়না খুলে জড়ালেন মাথায়। কোমরে শক্ত করে গামছা বেঁধে কাঁধে তুলে নিলেন একটি বড় লৌহদণ্ড। নেমে আসলেন দূর্গের প্রধান ফটকের কাছে। খুব ধীরে ও সাবধানে সেখানে তৈরী করলেন একটি ছিদ্র। সেই ছিদ্র পথ দিয়েই আল্লাহর দুশমনকে নিরীক্ষণ করতে থাকলেন সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টিতে। এক সময় তিনি লোকটির অবস্থান দেখে নিশ্চিত হলেন–এবার তার ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ চালানো সম্ভব

নিশ্চিত হয়েই চালিয়ে দিলেন চরম হামলা। সর্বশক্তি দিয়ে লৌহদণ্ডের আঘাত হানলেন তার মাথায়। এমন ভয়াবহ আঘাত সহ্য করা ছিল অসম্ভব। লোকটি ধপাস করে পড়ল মাটিতে

অবিলম্বে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঘাত হেনে তাঁর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন

প্রাণহীন নিথর দেহের কাছে নেমে আসলেন দ্রুত। নিজের সঙ্গে রাখা ছুরি দিয়ে মাথা কেটে দেহ থেকে আলাদা করে ফেললেন। দুর্গের উঁচুস্থান থেকে ছুড়ে মারলেন নিচের দিকে

ঢাল বেয়ে সেটা গড়াতে গড়াতে গিয়ে থামল সেই ইহুদীদের সম্মুখে যারা অপেক্ষা করছিল ঐ সঙ্গীর সবুজ সংকেতের

তারা সঙ্গী ইহুদীর কর্তিত মস্তক দেখে পরস্পর বলাবলি করতে থাকল আরে এটা তো আমরা নিশ্চিতরূপেই জানতাম যে, মুহাম্মাদ কখনোই নারী ও শিশুদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করে যাবার মানুষ নয়

এখন তো নিজেদের চোখেই দেখলাম

এসব বলতে বলতে তারা ফিরে গেল নিজেদের গন্তব্যে।

* * *

আল্লাহ তাআলার রেজা ও সন্তুষ্টি হোক ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের প্রতি। তিনি ছিলেন মুসলিম নারীদের এক অনন্য দৃষ্টান্ত

একাই করেছেন সন্তানের লালন-পালন, তবুও তাকে গড়েছিলেন আদর্শরূপে

আপন ভাইয়ের ভয়াবহ শাহাদাতের বিপদে আক্রান্ত হয়েছেন, সেখানে তিনি ছবর ও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন

কষ্ট-ক্লেশের ধকল বয়ে গেছে তার উপর দিয়ে, তার মাঝে পাওয়া গেছে এক দৃঢ়সংকল্প, বিচক্ষণ ও সাহসী নারীর স্বরূপ

ইতিহাস তার সোনালী পাতায় উজ্জ্বল হরফে লিখে রেখেছে–

'ছফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন প্রথম সেই নারী যিনি ইসলাম ধর্মে একজন মুশরিককে হত্যা করেছেন।'

নবীজীর স্নেহ-ভালবাসার ফুল

ফাতিমাতুয যাহরা

"মাহ্‌দী হবে আমার বংশ থেকে অর্থাৎ ফাতিমার বংশধারা থেকে।"
—মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ফাতিমাতুয যাহরা রাযিয়াল্লাহু আনহার জীবন কাহিনী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের (জীবন চরিত্রের) একটি আলোকিত অধ্যায়
নবী গৃহের জীবন প্রণালীর একটি চমৎকার ছবি
সাহাবা আদর্শের বিস্ময়কর এক দৃষ্টান্ত

* * *

ফাতিমাতুয যাহরা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্ম হয়েছিল পবিত্র কা'বার পূণনির্মাণের বছরে, যা ঘটেছিল নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে।
তাঁর মা যার মধ্যে দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, উচ্চবংশসহ প্রচুর সৎগুণের পাশাপাশি সমাবেশ ঘটেছিল অগাধ সম্পদের। জাহেলী যুগেই তাকে বলা হত তাহেরা' বা পবিত্র, তার নামের বিশেষণ ব্যবহৃত হত 'কুরাইশী নারীদের নেত্রী'।
তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিলেন এমন সময় যখন সকল মানুষ তাকে অস্বীকার করেছিল। তিনি তাঁকে মেনে ছিলেন সত্যবাদী বলে যখন মানুষ তাকে আখ্যায়িত করেছিল মিথ্যাবাদী রূপে। তিনি নিজের যাবতীয় সম্পদ তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে সময় সকল মানুষ তাঁকে করেছিল বঞ্চিত।
এই হল ফাতিমাতুয যাহরা রাযিয়াল্লাহু আনহা এর মা
আর তাঁর পিতা! তিনি ছিলেন সাইয়্যিদুল মুরসালীন (রাসূলগণের

সর্দার) খাতামুন নাবীয়্যিন (সর্বশ্রেষ্ঠ নবী) ও ইমামুল মুত্তাকীন (মুত্তাকীদের আদর্শ)। কী মহৎ এই বংশ!
কতো মহোত্তম এই পিতা!

* * *

ফাতিমাতুয যাহরা ছিলেন পিতা মাতার সর্বশেষ সন্তান, শেষ সন্তান সর্বদাই স্নেহ-মমতার আবেগকে অধিক আলোড়িত করে
লালিত হয় সর্বাধিক আদর ও ভালবাসার প্রশ্রয়ে
এ কারণেই ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরের ফুল
তিনি খুশি হতেন তাঁকে প্রসন্ন দেখলে, ব্যথিত হতেন তাঁর মুখভারী দেখলে।
তবে পিতা-মাতার স্নেহ-মমতা প্রতিবন্ধক হয়নি কর্তব্যের বোঝা বহনের জন্য তার প্রস্তুত হওয়া ও উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে উঠার পথে
বর্ণিত আছে যে, গৃহস্থালী কাজকর্ম তিনি একাই সম্পাদন করতেন, তাকে সহযোগিতা করার কেউ ছিল না। ওহোদের যুদ্ধে পিতার জখমে তিনিই ব্যান্ডেজ বেঁধেছেন, তার বয়স যখন বাড়ল এবং সাবালকত্বের পর্যায়ে উপনীত হলেন, অনেকের আগ্রহ সৃষ্টি হল তাঁর প্রতি। তাঁর জন্য বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন যারা তাদের তালিকায় ছিলেন আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকেই বিশেষভাবে উক্ত দু'জনকেও ফিরিয়ে দিলেন অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণভাবে। যেন তিনি কামনা করছিলেন তাঁর সঙ্গে নির্ধারিত হোক 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু'র জীবন।

* * *

অবশেষে হিজরতের অষ্টম বছরে 'আলী ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু ফাতিমাতুয যাহরাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম একেবারে যেন লুফে নিলেন সেই প্রস্তাব। ওদিকে 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় সাথে সাথে

আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাতে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। সিজদা থেকে যখন মাথা উঠালেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন–

بَارَكَ الله لَكُمَا و عَلَيْكُمَا، و أَسْعَدَ جَدكُمَا و أَخْرج مِنْكُمَا الكَثِيْر الطيب

(অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের জীবন বরকত ও রহমত দিয়ে পূর্ণ করে দিন, তোমাদের ভাগ্যে সুখ ও সমৃদ্ধি দান করুন। তোমাদেরকে নেককার ও উত্তম সন্তান দান করুন এবং দান করুন প্রচুর নেক ও উত্তম আমলের তাওফীক।)

'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন (মক্কা থেকে হিজরত করে আসা সাহাবীদের মধ্য থেকে) আবূ বকর, 'উমর, 'উসমান, তালহা এবং যুবাইর প্রমুখ মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম। এছাড়া প্রায় একই পরিমাণ আনসার সাহাবীও সেখানে ছিলেন উপস্থিত।
সকলে নিজ নিজ আসনে বসার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের খুতবা শুরু করলেন। তিনি বললেন–

الحَمْدُ لله المَحْمُوْدِ بِنِعْمَتِه، المَعْبُوْدِ بِقُدْرَتِه، إن اللهَ عَز و جَل جَعَلَ المُصَاهَرَةَ نَسَبًا لاَحِقًا، و أمْرًا مُفْتَرِضًا و حُكْمًا عَادِلاً، و خَيْرًا جَامِعًا، أوْشَجَ بِهَا الأَرْحَامَ و أَلْزَمَهَا الأَنَامَ، فقَالَ الله عز و جل "وَهُو الذِيْ خَلَقَ مِنَ الماءِ بَشَرًا فَجَعَلَه نَسَبًا و صِهْرًا، و كَانَ رَبكَ قَدِيْرًا" أشْهدُكُمْ أني زَوجْتُ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِي عَلى أرْبَع مِئَةِ مِثْقَال فِضةٍ إنْ رضِي بِذلِكَ عَلى السنةِ القَائِمَةِ، و الفَرِيْضَةِ الوَاجِبَةِ...فَجمَعَ الله شَمْلَهُمَا و بَارَكَ لَهُمَا و أطَابَ نَسْلَهُمَا...أقُوْلُ قَوْلِي هذا أسْتَغْفِرُ الله العَظِيْمَ.

(অর্থঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি প্রশংসিত অগণিত নেআমতের কারণে, যিনি মা'বুদ আপন ক্ষমতার কারণে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বৈবাহিক সূত্রের সম্পর্ককে করেছেন সংযোজিত বংশ, বিবাহকে বানিয়েছেন অবশ্য পালনীয়, বানিয়েছেন একটি সুসংগত বিধান ও ব্যাপক কল্যাণকর, এর মাধ্যমে আত্মীয়তা ও সম্পর্ককে রেখেছেন

প্রতিষ্ঠিত আর মানুষের জন্য একে করে দিয়েছেন বাধ্যতামূলক। মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন – (তরজমা) তিনিই মানবকে সৃষ্টি করেছেন পানি (বীর্য) থেকে, অতপর তাকে করেছেন রক্তগত বংশ ও বৈবাহিক সূত্রে সৃষ্ট সম্পর্কশীল। আর তোমার প্রভু সার্বিক ক্ষমতাবান।'

আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে চারশত মেছকাল (১৩১ ভরি) রূপার মোহরের ভিত্তিতে আমার মেয়ে ফাতিমাকে 'আলী ইবনে আবী তালেবের সঙ্গে তার সম্মতিতে; প্রতিষ্ঠিত রীতি ও অপরিহার্য কর্তব্যের আলোকে বিবাহ প্রদান করলাম

আল্লাহ তা'আলা তাদের জোড়াকে, সম্পর্ক ও বন্ধনকে অটুট রাখুন, তাদের দু'জনের জীবনে বরকত দান করুন, উৎকৃষ্ট বংশধর তাদেরকে দান করুন

আমার এই কথা (যা তোমরা শুনলে) আমি বলছি আর মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমার প্রার্থনা জানিয়ে শেষ করছি।)

মুসলিম নারীদের নেত্রীকে স্বামীগৃহে সম্প্রদান করা হল অথচ উল্লেখযোগ্য কোন সরঞ্জামই ছিল না তাঁর। সামান্য যে আসবাবগুলো তাঁর সঙ্গে পাঠানো হল তা ছিল– টানা রশির একটি খাট, একটি আঁশভর্তি চামড়ার বালিশ, একটি চামড়ার তৈরী (গামলাজাতীয়) বাসন, একটি পানপাত্র, একটি চালনা, একটি গামছা বা রুমাল, একটি চকমকি পাথর (যা ঘষে আগুন জ্বালানো হত), জাঁতাকলের দুইটি চাকা আর দু'টি কলস।

* * *

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমাতুয যাহরা রাযিয়াল্লাহু আনহার এই দূরত্বের কষ্ট সইতে পারলেন না। ফলে তিনি মনস্থ করলেন তাঁকে নিজের আশপাশে ফিরিয়ে আনবেন। তাঁর আশপাশের বাড়িঘর ছিল হারেসা ইবনে নু'মানের। তিনি ছুটে আসলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে। তিনি হৃদয়ের সবখানি আবেগ উজাড় করে দিয়ে বললেন, আমি শুনতে পেলাম, আপনি

ফাতিমাকে নিজের কাছাকাছি নিয়ে আসতে চান। এই যে দেখছেন আশপাশের এই সব বাড়ীই আমার, এগুলোই আপনার সবচেয়ে কাছের। আর আমি নিজে ও আমার সব মাল আল্লাহর জন্য এবং তাঁর রাসূলের জন্য উৎসর্গীত। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম– আমার যেই সম্পদটুকু আমার থেকে আপনি দয়া করে গ্রহণ করবেন, সেটা বাকি সম্পদের চেয়ে আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সমর্থন করে বললেন– তোমার বক্তব্য সত্য ও সঠিক, একদম খাঁটি তোমার ভালবাসা। আল্লাহ কবুল করুন এবং তোমার জীবনে বরকত দান করুন।

তিনি ফাতিমাকে নিয়ে আসলেন নিজের খুব কাছে এবং তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করলেন হারেসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি বাড়িতে।

* * *

যখন থেকে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পিতার পাশে বসবাস শুরু করলেন তখন থেকেই প্রতিদিন প্রভাতে তিনি মেয়ের বাড়ী যেয়ে হাজির হতেন। যখন ফজরের আযান হত তখন দরজার কড়া নেড়ে বলতেন–

السلام عليكم أهل البيت و يطهركم تطهيرا

(অর্থঃ হে গৃহবাসী! আস্সালামু আলাইকুম, আল্লাহ তোমাদের পবিত্র করুন, উঠে পড়)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সফর থেকে ফিরতেন তখন প্রথমে যেতেন মসজিদে, সেখানে দু'রাকাআত নামায আদায় করতেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে যেতেন ফাতিমার গৃহে, সেখানের অবস্থান দীর্ঘায়িত করতেন এরপর যেতেন স্ত্রীদের গৃহে।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে ক্বয়েস থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে বের হলেন, তাঁর সেই

সফরের সঙ্গী ছিলেন ‘আলী ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু। তাঁদের দু’জনের অনুপস্থিতির অবসরে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা প্রস্তুত করলেন দু’টি বালা, একটি গলার হার ও দু’টি দুল আর দরজায় ঝুলিয়ে দিলেন একটি সুন্দর পর্দা। এসবই করলেন পিতা ও স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তনের খুশিতে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফিরে এলেন তখন সাক্ষাত করতে গেলেন ফাতিমার সঙ্গে। বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকলেন তার সাহাবীরা। মেয়ের কাছে তাঁর দীর্ঘ অবস্থানের কারণে তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না যে ফিরে যাবেন নাকি অপেক্ষা করবেন। এমনি মুহূর্তে বের হয়ে আসলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর চেহারায় ফুটে উঠেছিল রাগের চিহ্ন। তিনি গিয়ে বসলেন মিম্বরে।

ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বুঝতে পারলেন যে তাঁর পিতা রুষ্ট হয়েছেন ঐ বালা, হার, দুল ও পর্দা দেখে

তখন তিনি সব অলঙ্কার খুলে ফেললেন, পর্দা নামিয়ে ফেললেন এবং পাঠিয়ে দিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে। বাহককে বলে পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলবে –

আপনার মেয়ে সালাম দিয়েছে এবং এগুলো আল্লাহর জন্য বিলিয়ে দিতে বলেছে। বাহকের মুখে সবকথা শুনে তিনি বললেন–

قد فعلت ـ فداها أبو ها ـ ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد، و لو كانت الدنيا تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء.

অর্থঃ অবশেষে সে সঠিক কাজটিই করল। তার পিতা তার জন্য উৎসর্গীত। আসলে দুনিয়ার চাকচিক্য মুহাম্মাদ ও তার পরিবারের জন্য নয়। দুনিয়া ও দুনিয়ার সুখ-শান্তি যদি আল্লাহর কাছে একটি মাছির পাখার পরিমাণ মূল্যবানও হত তাহলে (আল্লাহ শুধু তাঁর নেকবান্দাদেরকেই সুখ-সমৃদ্ধি দান করতেন এবং) কোন কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।

* * *

ফাতিমাতুয যাহরার গৃহ অতি শীঘ্র লাভ করল নেককার সন্তান-সন্ততির সুখ ও সৌভাগ্য। এই মহান পিতা-মাতাকে দান করা হল হাসান, হুসাইন ও মুহসিন অর্থাৎ তিন পুত্র

আর দুই কন্যা যায়নাব ও উম্মে কুলসূম।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশাল সুখানুভূতি আবর্তিত ছিল এই সব সন্তানকে ঘিরে। জানা যায় যে, হাসানের জন্ম হলে পিতা-মাতা তার নাম রেখেছিলেন 'হারব্'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন–

কোথায় আমার পুত্র? জলদি নিয়ে এসো।

প্রচণ্ড খুশিতে নাতিকে কোলে নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন–

তোমরা কী নাম রেখেছ এর?

'হারব্'। তাঁরা উত্তর দিলেন।

উঁহুঁ, হলো না, ওর নাম হবে 'হাসান'।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার সন্তানদের প্রচুর সোহাগ করতেন, শিশুদের মত কথা বলে, শিশুসুলভ কাজ করে ঘনিষ্ঠ হতেন তাদের, তিনি তাদের সঙ্গে কৌতুক করতেন, করতেন রসিকতা, তাদেরকে নাচাতেন, অনেক সময় নামাযের মধ্যে তাদের কেউ নানাজীর ঘাড়ে চড়ে বসত

তিনি তখন বিলম্বিত করতেন নামায, দীর্ঘ করতেন সেজদা যেন তাকে নামিয়ে দিতে না হয়।

তাঁর অভ্যাস ছিল মাঝে মাঝে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার গৃহে রাত কাটানোর; তখন তিনি তাঁর ছেলে-মেয়েদের দেখা-শোনা করতেন একাই। পিতা-মাতাকে ছুটি দিয়ে নিজেই তিনি করতেন ওদের সব খেদমত।

একরাতে তিনি শুনতে পেলেন হাসান পানি চাচ্ছে, তিনি উঠে পড়লেন এবং মশক থেকে পানি ঢালতে লাগলেন তখন হুসাইনও পানির জন্য হাত বাড়িয়ে দিল, তার হাত সরিয়ে তিনি প্রথমে পান করালেন

হাসানকে। এটা দেখে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন–
তাহলে কি হাসানই আপনার বেশি প্রিয়?
তিনি বললেন–
তা কেন হবে? তাকে প্রথমে দিলাম কারণ সেই প্রথমে চেয়েছিল।

* * *

ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন সাক্ষাৎ করতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে, তখন তিনি মেয়ের হাত ধরে স্বাগত জানাতেন। তাকে নিয়ে বসাতেন নিজের আসনে
আর যখন তিনি যেতেন মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য, তিনি উঠে পড়তেন পিতার সম্মানে, তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর হাত ধরে সেখানে চুমু দিতেন।
তিনি পিতার কাছে হাজির হলেন মুমূর্ষ অবস্থায়। মেয়েকে কাছে ডেকে কানের কাছে কিছু একটা বললেন, তাতে তিনি কেঁদে উঠলেন অল্প সময় পরে তিনি আবারও তাঁর কানে কানে কিছু বললেন এবার আর কাঁদলেন না বরং তার চেহারায় ফুটে উঠল মিষ্টি হাসির আভাস। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন আর মনে মনে চিন্তা করছিলেন–
'আমি এতদিন মনে করতাম অন্যদের চেয়ে এই মেয়েটির বিশেষ মর্যাদা আছে, ব্যক্তিত্ব আছে, দেখছি সেও অন্যদের মতই। এই দেখি কাঁদে এই দেখি হাসে।'
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে গেলে, তিনি একদিন ফাতিমার কাছে ঐ কান্না ও হাসির রহস্য জানতে চাইলেন। ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাব দিলেন–
প্রথমবার কানে কানে জানালেন তিনি মারা যাবেন, শুনে আমি কেঁদেছিলাম
দ্বিতীয়বার কানে কানে আমাকে জানালেন– তাঁর পরিবার থেকে সর্ব প্রথম আমিই তাঁর সঙ্গে মিলিত হব আখিরাতে, এতে আমি খুশি হয়ে হেসেছিলাম।

ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা পিতার ইন্তেকালের পর আর বেশিদিন অপেক্ষা করেন নি, অল্প কয়েকমাসের মধ্যেই চলে গেলেন চিরতরে এই পৃথিবী ছেড়ে, মিলিত হলেন নিজের পিতার সঙ্গে। কেউ বলেন– অল্প কয়েক মাস মানে ছয়মাস, কেউ বলেন তিন, কেউ বলেন দুইমাস।

হিজরতের একাদশ বর্ষে ফাতিমাতুয যাহরা রাযিয়াল্লাহু আনহা আপন প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিলেন, তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন পিতার সঙ্গে দ্রুত এই সংযুক্তিতে। তাঁর মৃত্যু যখন নিকটবর্তী হল, তিনি নিজ হাতে নিজের গোসল করলেন এবং আসমা বিনতে উমায়েসকে বললেন–

আমার নতুন পোশাক এনে দাও, তিনি পরলেন সেগুলো আর বললেন–

আমি গোসল সেরে ফেলেছি, কেউ যেন আমার কাফন উন্মুক্ত না করে

তিনি একটুখানি মুচকি হাসলেন, পিতার ইন্তেকালের পর তাকে কেউ কখনো হাসতে দেখেনি কেবল ঐ মুহূর্তটি ছাড়া যখন তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

আল্লাহ! তুমি বিস্তীর্ণ রহমতের বর্ষণ কর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহ-ভালবাসার ফুল ফাতিমার প্রতি, তাঁকে বধূর বেশে 'আলী রযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পাঠানো হয়েছিল রমযান মাসে

আবার জান্নাতেও পাঠানো হলো রমযান মাসেই।

আসমা বিনতে আবু বকর

(দুই ফিতাওয়ালী)

"আসমা বেঁচেছিলেন একশ বছর অথচ তাঁর কোন একটি দাঁতও পড়েনি এবং বুদ্ধি বিবেকের মধ্যেও কোন ত্রুটি ধরা পড়েনি।"– ঐতিহাসিকবৃন্দ

আমাদের এবারের এই সাহাবিয়ার জীবনে সমাবেশ ঘটেছিল সম্মান ও গৌরবের প্রত্যেকটি দিকের

তাঁর পিতা সাহাবী, দাদা সাহাবী, বোন একজন সাহাবীয়া, স্বামী একজন সাহাবী, পুত্রও একজন সাহাবী

মর্যাদা ও গৌরবের জন্য তাঁর আর কী প্রয়োজন!

তাঁর পিতা আবু বকর ছিলেন সিদ্দীক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় তাঁর একনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম বন্ধু আর ইন্তেকালের পর ছিলেন তাঁর প্রথম ও প্রধান খলীফা

তাঁর দাদা ছিলেন আবু আতীক, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পিতা

তাঁর বোন উম্মুল মুমিনীন 'আয়েশা তাহেরা যিনি আসমান থেকে ওহীর মাধ্যমে নিষ্কলুষ চরিত্রের সনদপ্রাপ্তা

আর তাঁর স্বামী তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ সাহায্যকারী রক্ষী যুবাইর ইবনুল আউয়াম

তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, রাযিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আনহুম আজমাঈন

সংক্ষেপে তিনি হলেন আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক

আসমা ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী অগ্রগামী মুসলিমদের অন্যতমা, তাঁর পূর্বে এই মর্যাদা অর্জনকারী নারী-পুরুষ মিলিয়ে মাত্র সতেরজন

তাঁকে ডাকা হত 'দুই ফিতাওয়ালী', কারণ তিনি মদীনায় হিজরতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পিতার জন্য খাবার

তৈরী করেছিলেন। পানির ব্যবস্থা করেছিলেন।
ঐ খাবার ও পানির মশক কোমরে বাঁধার জন্য কিছু খুঁজে না পেয়ে নিজের কোমরের ফিতা ছিড়ে দু'ভাগ করে ফেললেন। একটি দিয়ে বাঁধলেন খাবার অন্যটি দিয়ে পানির মশক।
এই চিত্র দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দু'আ করলেন–আল্লাহ তাআলা যেন ঐ দুই ফিতার বিনিময়ে তাঁকে জান্নাতের দু'টি ফিতা দান করেন
সে কারণেই তাঁকে ডাকা হয় 'দুই ফিতাওয়ালী' নামে।

* * *

যুবাইর ইবনুল আউয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু এক দরিদ্র যুবক। তিনি আসমাকে বিবাহ করেন, যার কাজে সাহায্য করার মত কোন খাদেম ছিল না। সংগৃহীত একটি ঘোড়া ছাড়া তার এমন কোন সম্পদও ছিল না যা দ্বারা পরিবারের অভাব ও প্রয়োজন মেটাবেন।
তা সত্ত্বেও আসমা নিজেকে স্বামীর সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন আদর্শ স্ত্রী রূপে, তিনি তাঁর সেবা করতেন, তাঁর ঘোড়ার দেখাশোনা, খাওয়ার সংগ্রহসহ সব কাজ সম্পন্ন করতেন, এভাবেই একদিন আল্লাহ তাআলা তার স্বামীর জন্য বরকতের দুয়ার খুলে দিলেন। তিনি হয়ে গেলেন সর্বাধিক সম্পদশালী সাহাবীদের একজন।
যখন মক্কা থেকে লুকিয়ে আল্লাহর দীন নিয়ে মদীনায় হিজরতের সুযোগ এলো, ততদিনে পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর গর্ভে এসে গেছে। কিন্তু গর্ভের সেই কষ্ট এবং দীর্ঘ সফরের প্রতিকূল আশঙ্কা কোন কিছুই তাকে দমাতে পারল না।
তিনি যখন 'কুবা'তে পৌছালেন, সেখানেই তাঁর ছোট্ট শিশু ভূমিষ্ঠ হলো
মুসলিমগণ সেখানেই চিৎকার করে 'আল্লাহু আকবার' ও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র আনন্দ ধ্বনি উঠালেন। কেননা এটাই ছিল মদীনার মাটিতে মক্কার মুহাজিরদের প্রথম সন্তান।
আসমা আপন পুত্রকে নিয়ে গেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে এবং তুলে দিলেন তাঁর কোলে। তিনি সামান্য খেজুর চিবিয়ে মুবারক থুথু মেশানো সেই খাবার শিশুটির মুখে দিয়ে দিলেন এরপর তার জন্য দু'আ করলেন

ভাগ্যবান শিশুটির পেটে সর্বপ্রথম যা প্রবেশ করল তা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক থুথু।

* * *

আসমা বিনতে আবু বকর এর প্রকৃতিতে সমাবেশ ঘটেছিল নেক ও কল্যাণের বহু স্বভাব, আভিজাত্যের গুণাবলী, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও দূরদর্শিতা যা দেখা যেত শুধু কেবল দুর্লভ কিছু পুরুষের মাঝে।

দানশীলতা ও বদান্যতা ছিল তাঁর প্রবাদতুল্য।

তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন–

আমি কখনো এমন দু'জন মহিলার দেখা পাইনি যারা আমার খালা আয়েশা ও আমার মা আসমা এর চেয়ে অধিক দানশীল। তবে তাঁদের দু'জনের দানের ধরণ ছিল ভিন্ন ভিন্ন

আমার খালা একটু একটু করে বিভিন্ন বস্তু জমা করতেন, যথেষ্ট পরিমাণ হয়ে গেলে সেটা অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন

আর আমার মা কোন কিছুই জমা রাখতেন না, যাই হাতে পেতেন দান করে দিতেন

* * *

আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন অনন্য সাধারণ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করতেন সর্বদাই।

এর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর পিতা আবু বকর সিদ্দীকের হিজরতের সময়ে। মদীনায় হিজরতের সময় তিনি নিজের সমুদয় মাল নিয়ে বের হয়েছিলেন। যার পরিমাণ ছিল ছয় হাজার দিরহাম। নিজ পরিবারের জন্য কিছুই তিনি রেখে যান নি।

যখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হিজরতের সংবাদ জানতে পারলেন

পিতা আবু কুহাফাও তখন যিনি ছিলেন একজন মুশরিক, বাড়ী ফিরে তিনি আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা কে বললেন–

নিশ্চয় সে তোমাদেরকে অভাবের মধ্যে ফেলে গেছে, নিজের সম্পদ অন্যের জন্য খরচ করে নিজেতো ফকীর হয়েছেই এবার তোমাদেরকেও ফকীর ও নিঃস্ব বানিয়ে গেল। আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন–

'না, না দাদু! বাবা তো প্রচুর অর্থ রেখে গেছেন আমাদের জন্য। একথা বলে দেয়ালের যে ফাঁকা স্থানে টাকা পয়সা রাখা হতো তিনি সেখানে অনেক পাথর কাপড় দিয়ে ঢেকে অন্ধ দাদুর হাত ধরে সেখানে নিয়ে গিয়ে বললেন–

দাদু! তুমি এইখানে হাত দিয়ে দেখ, বাবা আমাদের জন্য কত অর্থ রেখে গেছেন। তিনি ঐ কাপড়ের উপর হাত দিয়ে আশ্বস্ত হয়ে বললেন, তাহলে আর সমস্যা কি! এগুলো সব যদি তোমাদের জন্য রেখে গিয়ে থাকে তাহলে ভালই করেছে।

আসলে এর মাধ্যমে তিনি চেয়েছিলেন বুড়োকে প্রবোধ দিতে, আরো চেয়েছিলেন বুড়ো যেন তাঁর পেছনে এক পয়সাও ব্যয় করতে না পারে

কারণ কোন মুশরিকের করুণা নিতে তাঁর ছিল ভীষণ আপত্তি, এমন কি তিনি নিজের দাদু হলেও

* * *

ইতিহাস আসমা বিনতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহার সকল অবদান ও কৃতিত্বের কথা ভুলে যেতে পারলেও পুত্রের সর্বশেষ সাক্ষাতের সময় তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা, অবিচল প্রত্যয় আর বিচক্ষণতার কথা কখনোই ভুলতে পারবে না।

ঘটনাটি ছিল এই– ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার মৃত্যুর পর আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর কে খলীফা মেনে তাঁর পক্ষে যখন বাইয়াত নেয়া হল, হেজায, মিশর, ইরাক, খুরাসান ও সিরিয়ার প্রায় সকল অঞ্চল তাঁর পক্ষ নিল।

এদিকে বানূ উমাইয়া অনতিবিলম্বে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে

একদল দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল দুই দলের মাঝে সংঘটিত হল ভয়াবহ যুদ্ধ, ইবনুয যুবাইর সে যুদ্ধে দুর্দান্ত, দুঃসাহসী যোদ্ধার আক্রমণ পরিচালনা করে চূড়ান্ত বীরত্বের প্রকাশ ঘটালেন।
তবে তাঁর সহযোদ্ধারা একটু একটু করে তাঁর থেকে বিছিন্ন হতে থাকল। অবশেষে তিনি 'বাইতুল্লাহ' বা কা'বা শরীফে আশ্রয় নিলেন, তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা কা'বার প্রতিরক্ষার সাহায্যে আত্মরক্ষা করলেন

* * *

তাঁর চূড়ান্ত শাহাদাতের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি সাক্ষাত করতে গেলেন মায়ের সঙ্গে, ততদিনে তিনি দৃষ্টি হারানো অতিবৃদ্ধা এক নারী, তিনি মাকে সালাম দিলেন,
–আস্‌সালামু আলাইকি ইয়া উম্মাহ ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুল্লাহ ...(মা, তোমার প্রতি ...)
–ওয়াআলাইকাস্ সালাম ইয়া আব্দাল্লাহ ... (বেটা! তোমাকেও সালাম) বেটা! যে সময় হাজ্জাজের কামান তোমার বাহিনীর বিরুদ্ধে হারামের মধ্যে বিশাল বিশাল পাথর নিক্ষেপ করছে, যা মক্কানগরীর বাড়ীঘরকে প্রকম্পিত করে তুলছে, এমন নাজুক মুহূর্তে তুমি এখানে কেন বেটা?
–তোমার সাথে পরামর্শের জন্য এসেছি মা।
–আমার সাথে পরামর্শ!! কী বিষয়ে?!
–মা! লোকেরা আমাকে নিরাশ করে দিয়েছে, তারা হাজ্জাজের ভয়ে অথবা তার প্রতি মোহে আমার নিকট থেকে দূরে সরে গেছে।
এমনকি আমার নিজের পরিবারের ও আপন লোকেরাও আমাকে ফেলে দূরে সরে গেছে, এখন ছোট্ট একটি দলের সামান্য কয়েকজন মানুষ ছাড়া আমার সঙ্গে আর কেউ নেই। তারা যত বড়ই কষ্টসহিষ্ণু হোক না কেন এক ঘণ্টার বেশি আর টিকে থাকতে পারবে না
বানূ উমাইয়ার দূতেরা আমার নিকট বলাবলি করছে যে আমি অস্ত্র ত্যাগ করে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলে তারা আমাকে এই পৃথিবীর যা চাইব তাই দেবে, এ ব্যাপারে মা তোমার কী মত?

তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন–

–সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে হে আব্দুল্লাহ! তোমার মনের কথা তুমিই জান ভালো।

যদি তোমার আস্থা থাকে যে তুমি প্রতিষ্ঠিত আছো হকের ওপর আর প্রয়াস চালাচ্ছো হক প্রতিষ্ঠার তাহলে তুমি অবিচল থাক, যেভাবে অবিচল ছিল তোমার সেই সঙ্গীরা, যারা তোমার পতাকাতলে লড়াই করে শহীদ হয়েছে   যদি দুনিয়ার কিছু অর্জনের আশা তুমি পোষণ করে থাক তাহলে কত যে খারাপ মানুষ তুমি   তুমি নিজের জীবনটাও বরবাদ করেছ আর বরবাদ করেছ তোমার সঙ্গীদেরও।

ইবনুয যুবাইর বললেন–

–কিন্তু আমি তো আজকেই নিহত হয়ে যাব।

–সেটা তোমার জন্য অনেক ভাল স্বেচ্ছায় নিজেকে হাজ্জাজের হাতে তুলে দিয়ে নিজের কর্তিত মস্তক বানূ উমাইয়ার বালকদেরকে খেলতে দেওয়ার চেয়ে

–আমি নিহত হওয়ার ভয় পাচ্ছি না। আমি ভয় পাচ্ছি এই যে, আমার মৃতদেহকে বিভৎসরূপে বিকৃত করা হবে।

–নিহত হওয়ার পর ভয় পাওয়ার আর কিছু নেই, যবাইকৃত ছাগল ছাল ছোলার কষ্ট পায় না।

মমতাময়ী মায়ের মুখে বেদনাময় বাস্তব কথাগুলো শুনে, নিজের কর্তব্য স্থির করতে পেরে তার চেহারা ঝলমল করে উঠল। তিনি আবেগ আপ্লুত হয়ে বললেন–

মাগো, রহমত ও বরকতপ্রাপ্তা হও তুমি, তোমার সুমহান মর্যাদার আরো বৃদ্ধি ঘটুক।

মাগো, তুমি জানতে চেয়েছিলে এমন নাজুক মুহূর্তে কেন আমি এখানে এসেছি। এবার শোন মা! অন্য কোন কারণে নয়, শুধু তোমার এই কথাগুলো শুনতেই ছুটে এসেছিলাম তোমার কাছে। আমার আল্লাহ জানেন আমি শক্তিহীন, দুর্বল ও ক্লান্ত হই নি। এ ব্যাপারে তিনিই আমার সাক্ষী যে, আমি দুনিয়ার কোন লালসায়, ক্ষমতার মোহে এসব কিছু করি নি, যা কিছু করেছি তার কারণ এটাই যে, (শাসকগণ) হারাম

কে মুবাহ করে দিয়ে, অবৈধকে বৈধ করে দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করেছে। আমি শুধু আল্লাহর জন্য ক্রুদ্ধ হয়েছি ...

এই দেখ মা! আমি এখন যাচ্ছি তোমার পছন্দনীয় পথে, আমি নিহত হলে আমার জন্য দুঃখ করো না মা! আর তোমার নিজের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য সমর্পিত রইল

–বেটা ! তোমার জন্য দুঃখ করতাম যদি তুমি বাতিলের জন্য জীবন দিতে।

–মাগো, তুমি সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত থাকো, তোমার পুত্র জীবনে কখনো কোন অন্যায় কাজের সংকল্প করে নি, কখনোই কোন অশ্লীল কাজ করে নি, কখনোই আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে নি, কোন আমানতের খেয়ানত করে নি, কখনো কোন মুসলিমের প্রতি অথবা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি জুলুম করে নি, আর শোন মা! তোমার পুত্রের কাছে আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে দামী আর কিছুই ছিল না

মাগো, এসব কথা আমি নিজের বুযুর্গী প্রকাশের জন্য বলি নি, কারণ আমার সম্পর্কে আমার চেয়ে আল্লাহই বেশি জানেন, তবে একথাগুলো তোমাকে জানালাম যেন তুমি নিজেকে ধৈর্যধারণ করাতে পার।

–আলহামদুলিল্লাহ! প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে পরিচালিত করেছেন সেই পথে যা তাঁর পছন্দনীয় এবং যা আমারও পছন্দনীয়

তুমি একটু আমার কাছে আসো বেটা, আমি একটুখানি তোমার ঘ্রাণ নিব, তোমার শরীরটা একটু ছুঁয়ে দেখব। কারণ এটাই যে তোমার আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ!

আব্দুল্লাহ নিচু হয়ে মায়ের হাত ও পায়ে চুমু দিয়ে ভরে দিলেন আর মা পুত্রের মাথায় চেহারায় ও ঘাড়ে নাক ঘষে ঘষে ঘ্রাণ নিলেন আর চুমু দিয়ে মমতা মাখিয়ে দিলেন

দুই হাত সচল রাখলেন তাঁকে স্পর্শ করতে। হঠাৎ হাত গুটিয়ে নিয়ে বললেন–

–আব্দুল্লাহ ! এটা কী পরেছ?

–লৌহ বর্ম।

–যে ব্যক্তি শহীদ হতে চায় এটা তার পোশাক হতে পারে না বেটা।

–মা, এটা তো বরং তোমাকে খুশী করার জন্য পরেছি।
–ওটা খুলে ফেল, তোমার ঐ ভারী বর্মমুক্ত শরীরটাই হবে সাহসী ভূমিকার বেশি সহায়ক। সামনে-পিছে নড়াচড়ার জন্য সহজ
তবে ওটার পরিবর্তে তুমি দ্বিগুণ পাজামা পরে নাও, যেন মাটিতে পড়ে গেলে তোমার ছতর উন্মুক্ত না হয়।

* * *

আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর লৌহবর্ম খুলে ফেললেন, কয়েকটি সালোয়ার পরলেন, এগিয়ে গেলেন হারামের দিকে, চিৎকার করে বলতে থাকলেন–
–মা, আমার জন্য তোমার দুআ বন্ধ করো না।
মা দু'হাত ঊর্ধ্বে উঠিয়ে বললেন–
"হে আল্লাহ! নামাযে তার দীর্ঘ কিয়ামের (খাড়া হওয়ার) প্রতি রহম কর, রহম কর গভীর রাতে জগতবাসীর নিদ্রাবিভোর মুহূর্তে তার বুক ফাটা ক্রন্দনের প্রতি
হে আল্লাহ! মক্কা মদীনায় গ্রীষ্মের প্রচন্ড তাপদাহের দিনে নফল রোযা রেখে তার ক্ষুধা আর পিপাসার যন্ত্রণা সহ্য করার প্রতি তুমি রহম কর, করুণা কর
হে আল্লাহ! পিতা-মাতার প্রতি তার আনুগত্যের ওপর রহম কর
হে আল্লাহ! আমি ওকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছি তোমার জন্য, তুমি যা ফয়সালা করবে আমি তাতেই সন্তুষ্ট, সুতরাং তার ব্যাপারে আমাকে দান কর ধৈর্যশীলদের প্রতিদান
ঐদিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর পৌঁছে গেলেন আপন প্রভূর সান্নিধ্যে
তাঁর শাহাদাতের দশ-পনের দিন পরই তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন তাঁর মা আসমা বিনতে আবু বকর
যাঁর বয়স হয়েছিল একশ' বছর অথচ তাঁর একটি দাঁতও পড়ে নি, তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি একটুও হ্রাস পায় নি।

নাসীবাহ আল্ মাযেনিয়্যা

"ওহোদ যুদ্ধের সময় ডানে বামে তাকালেই দেখেছি উম্মে 'উমারা আমাকে নিরাপদ রাখার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে।"

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে আজ রাতের প্রথম প্রহর শেষে।'

মদীনার এক মুসলিমের কানে কানে ফিস্ফিস করে কথাটি বললেন মুছ'আব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু। প্রভাতের ঠাণ্ডা বাতাসের মত ক্ষিপ্র ও দ্রুত গতিতে সকলের কাছে ছড়িয়ে পড়ল খবরটি।

খবরটি সম্পর্কে সেই সকল মুসলিম অবহিত হলেন, যারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় লুকিয়ে মদীনা থেকে এসেছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মক্কার উদ্দেশে ছুটে আসা মুশরিক হজ্জ পালনকারীদের মধ্যে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছেন

রাত এসে গেল, তাই মুশরিক হজ্জ পালনকারীগণ নিদ্রার কোলে সমর্পিত হলেন

দেব-দেবীর নামে পশু বলিদান

দেব-দেবীর প্রদক্ষিণে কষ্ট ও ক্লান্তিকর দিবস কাটানোর পর তারা গভীর নিদ্রায় হাবুডুবু খেতে লাগলেন।

কিন্তু মুছ'আব ইবনে উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথীরা–যারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ গোপন রেখে বিভিন্ন লোকজনের মাঝে ঘাপটি মেরে আছেন, তাদের চোখের পাতা মিলিত হল না

কেন তাদের চোখের পাতা বিস্ফারিত হবে না!

অন্তরগুলো যে ধুক্ধুক্ করেই চলেছে, সৌভাগ্যের দুয়ার উন্মোচনকারী

এক সাক্ষাতের উত্তেজনাপূর্ণ আনন্দে, যার জন্য তারা পার করে এসেছে জনশূন্য ঊষর মরুর কতনা ধূসর প্রান্তর! প্রিয় হাবীব তাঁদের প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন আকাঙ্খার আতিশয্যে তাদের অন্তরআত্মা যেন পিঞ্জর ছেড়ে উড়াল দেবে।

কারণ তাদের বেশিরভাগই নবীজীর প্রতি ঈমান এনেছেন তাঁর সাক্ষাৎ সৌভাগ্য ছাড়াই

তাঁর আদর্শের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে নিয়েছেন তাদের চোখ তাঁর দর্শন সুরমায় সজ্জিত হওয়ার পূর্বেই ...

* * *

আইয়্যামে তাশরীকের[১] মাঝামাঝি রাতের প্রথম প্রহরের শেষ মুহূর্তে 'মিনা' প্রান্তরের 'আকাবা' উপত্যকায় ঘটল মহাগুরুত্বপূর্ণ সেই সাক্ষাৎ কুরাইশের সম্পূর্ণ অগোচরে

বাহাত্তরজন পুরুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মুখে এগিয়ে এলেন, তারা প্রত্যেকে একে একে তাঁর দু'হাতে রাখলেন নিজেদের হাত। বাইয়াত গ্রহণ করলেন। এই মর্মে শপথের বাক্য উচ্চারণ করলেন যে, দুশমন থেকে তাঁকে তাঁরা রক্ষা করবে যেমনটি তারা করে থাকে নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের বেলায়

পুরুষদের বাইয়াত শেষ হলে এগিয়ে এলেন দু'জন নারী, পুরুষদের মত তারা দু'জনও বাইয়াত গ্রহণ করলেন

হাতে হাত রাখার পর্বটি ছাড়া

কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের সঙ্গে হাত মেলাতেন না। এই দুই নারীর একজন পরিচিত ছিলেন 'উম্মে মানী'[২] নামে–

আর দ্বিতীয় জন ছিলেন নাসীবা বিনতে কা'আব আল মাযেনিয়্যা, যিনি পরিচিত– 'উম্মে 'উমারা' নামে।

* * *

১–আইয়্যামে তাশরীক– ঈদুল আযহার পরবর্তী তিনদিন।

২–উম্মে মানী- বিখ্যাত সাহাবী মুআয ইবনে জাবালের মা।

উম্মে 'উমারা ফিরে আসলেন মদীনায়, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সম্মান (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাৎ লাভের চরম সৌভাগ্য) বুকে নিয়ে

বাইয়াতের শর্তসমূহ পূরণ করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে

এরপর পেরিয়ে গেল বহু সময় বহু দিন ও মাস   তারপর একদিন এসে গেল ওহোদের যুদ্ধ। সে যুদ্ধে উম্মে 'উমারার রয়েছে এক বিরাট ভূমিকা, আহ্! কী যে উজ্জল সেই ভূমিকা!

উম্মে 'উমারা ওহোদের ময়দানের উদ্দেশ্যে বের হলেন নিজের পানির পাত্রটি নিয়ে, উদ্দেশ্য তাঁর আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামকারীদের তৃষ্ণা নিবারণ করা।

আরো নিয়েছেন জখমের একগুচ্ছ পট্টি, (ব্যাণ্ডেজের প্যাকেট) আহতদের সেবা দিতে ও জখমে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে

আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা ময়দানে থাকবেন তাঁর স্বামী আর কলিজার তিনটি অংশ ঃ

এক অংশ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর অপর দুই অংশ হলো তাঁর দুই পুত্র হাবীব ও আব্দুল্লাহ ...

তাছাড়া তুলনামূলকভাবে তাঁর প্রাণপ্রিয় রাসূল আর আল্লাহর দীন এর হেফাজতে দুশমনদের আক্রমণ প্রতিরোধকারী মুসলিম ভাইয়েরাও তাঁর প্রিয় মানুষ।

ওহোদের যুদ্ধে ঘটে গেল যা ঘটার ছিল

উম্মে 'উমারা নিজের দু'চোখে দেখলেন–কীভাবে মুসলিম বাহিনীর বিজয় মহা বিপর্যয়ে রূপান্তরিত হল

তিনি দেখলেন কীভাবে মুসলিম বাহিনীর কাতারে হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়ল এবং একের পর এক তাদের লাশ পড়তে থাকল

কীভাবে তাদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল আর তারা প্রাণ প্রিয় নবীজীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, অবশেষে মাত্র দশজনের বেশি কাউকেই তাঁর পাশে দেখা গেল না

যা দেখে কাফিরদের এক ঘোষক চিৎকার করে বলতে লাগল ঃ

মুহাম্মাদ খুন হয়েছে ... মুহাম্মাদ খুন

এমন মুহূর্তে উম্মে 'উমারা তাঁর পানির পাত্র ছুঁড়ে ফেলে, ক্ষিপ্রগতিতে আক্রান্ত চিতার মত ময়দানের দিকে ছুটে গেলেন

চলো, এই ভয়াবহ কঠিন মুহূর্তের বর্ণনার ভার ছেড়ে দেই খোদ উম্মে 'উমারার কাছে, কারণ তিনিই পারবেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঐ সময়ের সঠিক বিবরণ দিতে।

উম্মে 'উমারা বলেন–

'খুব সকালে আমি ওহোদের ময়দানে গেলাম, আমার হাতে ছিল একটি পানির মশক, যা থেকে আমি মুজাহিদ ভাইদের পানি পান করাব। একসময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম, শক্তি, বিজয় ও সাহায্যের পাল্লা তখন তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের দিকে ঝুঁকে ছিল

একটু পরেই মুসলিম বাহিনী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন ফলে তিনি পড়ে রইলেন সামান্য কয়েকজনের প্রহরার মধ্যে যাদের সংখ্যা দশের উপরে নয়

ফলে আমি, আমার স্বামী ও পুত্র দ্রুত এগিয়ে গেলাম তাঁর নিকট

বালা যেমন কবজিকে ঘিরে রাখে আমরা ঠিক সেভাবেই তাঁকে ঘিরে রাখলাম আর আমাদের সকল শক্তি ও অস্ত্র দিয়ে তাঁর উপর থেকে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে থাকলাম

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন মুশরিকদের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার কোন ঢাল আমার কাছে নেই।

এরপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল পলায়নপর একজনের প্রতি যার নিকট ছিল একটি ঢাল। তিনি ডেকে তাকে বললেন, 'তোমার ঢালটি এমন কাউকে দিয়ে যাও যে লড়াই করছে।' লোকটি নিজের ঢাল ফেলে দিয়ে চলে গেল আমি সেটা তুলে নিলাম এবং রাসূলের প্রতি আক্রমণ ঠেকাতে লাগলাম।

আমি প্রিয়নবীর প্রতিরক্ষায় তরবারি চালিয়ে তীর ছুঁড়ে আমার সর্বশক্তি

ব্যয় করতে করতে এক পর্যায়ে অক্ষম হয়ে পড়লাম। আমার শরীরের গভীর ক্ষতগুলো আমাকে অপারগ করে দিল।

এমন এক কঠিন মুহূর্তে উত্তেজিত উটের মত চিৎকার করে 'ইবনে কামিআ' বলতে থাকল,

কোথায় মুহাম্মাদ?

গেল কোথায় ...?

আমি আর মুছ'আব ইবনে 'উমায়ের আগলে দাঁড়ালাম তার পথ, তখন সে তরবারির আঘাতে মুছ'আবকে ভূপাতিত করল, আরেক আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেলল

এরপর ভয়াবহ আঘাত করল আমার কাঁধে, যাতে সৃষ্টি হল গভীর ক্ষত

তারপরও আমি তার উপর উপর্যুপরি আঘাত করলাম, কিন্তু আল্লাহর দুশমনের গায়ে ছিল দুইটি বর্ম '

নাসীবা আলমাযেনিয়্যা (উম্মে 'উমারা) আরও বলেন–

'যে মুহূর্তে আমার পুত্র রাসূলের উপর থেকে অবিরাম আক্রমণ প্রতিহত করে যাচ্ছিল হঠাৎ তাকে ভীষণ আঘাত করে বসল এক মুশরিক, যাতে তার বহু কেটে বিছিন্ন হবার উপক্রম হল

ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকল

আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম, সেখানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলাম। কোমল সুরে তাকে বললাম ঃ

আমার বেটা! আল্লাহর জন্য উঠে পড়, আল্লাহর দুশমনদের খতম করতে এগিয়ে যাও উঠ বেটা উঠ

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে ফিরে তাকালেন আর বললেন–

'তুমি যা করতে পারলে এমনটি আর কে পারবে হে উম্মে 'উমারা?!'

এরপর সেখানে এগিয়ে আসতে লাগল সেই লোকটি যে আমার পুত্রকে আঘাত করেছিল, তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন,

'উম্মে 'উমারা! এই দেখ, এটাই তোমার পুত্রের ঘাতক।'

দৌড়ে আমি এক লাফে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তরবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করলাম তার পায়ের নলায়, ধপাস করে পড়ে গেল সে মাটিতে
আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম, তরবারি ও বর্শার উপর্যুপরি আঘাতে তাকে শেষ করে দিলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন–
'তুমি তো তার কেসাস নিয়ে ফেললে, উম্মে 'উমারা
আল্লাহরই প্রশংসা করছি যিনি তোমাকে কেসাস গ্রহণে সফল করলেন... তোমাকে নিজের চোখেই তার পতন দেখিয়ে দিলেন।'

* * *

উম্মে 'উমারার দুই পুত্রের বীরত্বও পিতা-মাতার চেয়ে কম ছিল না, তাদের ত্যাগ ও কুরবানীও পিতা-মাতার চেয়ে তুচ্ছ ছিল না
কারণ সন্তান তো পিতা মাতার আদর্শই পেয়ে থাকে, তারা হয় মা-বাবারই বাস্তব দৃষ্টান্ত।
তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন–
ওহোদের যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ময়দানে হাজির হয়েছিলাম। লোকেরা যখন তাঁর নিকট থেকে দূরে সরে পড়ল, আমি আর আমার মা তাঁর নিকটবর্তী হলাম তাঁর উপর থেকে আক্রমণ ঠেকাতে ঠেকাতে।
নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন–
–তুমি কি উম্মে 'উমারার পুত্র?
–হ্যাঁ,
–মারো, আঘাত কর
তাঁর সামনে এক মুশরিককে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড শক্তিতে একটি পাথর নিক্ষেপ করলাম, সাথে সাথে লোকটি মাটিতে পড়ে গেল, আমি পাথর ছুড়তে ছুড়তে তার উপর পাথরের স্তুপ বানিয়ে ফেললাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি দিলেন।

দৃষ্টি একটু সরাতেই তাঁর চোখে পড়ল আমার মায়ের কাঁধের জখম, সেখান থেকে ফোটে ফোটে রক্ত ঝরছিল। তিনি সচকিত হয়ে বললেন–
‘তোমার মাকে দেখ তোমার মা
ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দাও। আল্লাহ তোমাদের পরিবারের মধ্যে বরকত দান করুন
তোমার মায়ের মর্যাদা অমুক অমুকের চেয়ে উর্ধ্বে
আল্লাহ রহম করুন তোমাদের সকলের উপর।’
আমার মা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন–
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই দু‘আ করুন–
আমরা যেন জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু‘আ করলেন–
‘ইয়া আল্লাহ! জান্নাতে ওদেরকে আমার সঙ্গী বানিয়ে দাও’।
এই দু’আ শুনে আমার মা বললেন–
‘এর পরে আমি আর কোন কিছুরই পরোয়া করি না, দুনিয়াতে আমার যা হয় হোক। আমার কিছু আসে যায় না।’
উম্মে ‘উমারা রাযিয়াল্লাহু আনহা অহুদের ময়দান থেকে গভীর ক্ষত নিয়ে আর তাঁর জন্য রাসূলের বিশেষ সেই দু‘আ নিয়ে ফিরে আসলেন।
আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহোদের ময়দান থেকে ফিরলেন এই কথা বলে–
‘আমি যখনই ডানে, বামে তাকিয়েছি দেখেছি উম্মে ‘উমারা আমার প্রতিরক্ষায় লড়াই করছে।’

* * *

উম্মে ‘উমারা ওহোদের প্রান্তরে লড়াইয়ের প্রথম প্রশিক্ষণ নিলেন, যুদ্ধের ব্যাপারে দক্ষতা লাভ করলেন
স্বাদ উপভোগ করলেন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর, ফলে জিহাদ থেকে দূরে সরে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।
তাঁর নামে লিপিবদ্ধ রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অধিকাংশ যুদ্ধে শামিল থাকার বিরল গৌরব গাঁথা

তিনি হাজির ছিলেন হুদাইবিয়াতে, খাইবারে

উমরাতুল কাযা-তে, হুনাইনে

বাইয়াতে রিযওয়ানে

কিন্তু ঐ সব কিছুকেই সামান্য মনে হয় যখন আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসন আমলে সংঘটিত 'ইয়ামামা'র যুদ্ধে তাঁর ভূমিকার সাথে তুলনা করা হয়।

* * *

'ইয়ামামা'র যুদ্ধে উম্মে 'উমারার কাহিনীর সূচনা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কাল থেকেই।

তাঁর পুত্র হাবীব ইবনে যায়েদকে দূত হিসাবে ভণ্ডনবী মুসাইলামাতুল কাযযাব এর নিকট পাঠিয়েছিলেন রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মুসাইলামা বিশ্বাসঘাতকতা করে হাবীবকে এমন নিষ্ঠুর-নির্দয়ভাবে হত্যা করে যা শুনলে লোম শিউরে উঠে।

বিষয়টি ছিলো এমন, মুসাইলামা প্রথমেই হাবীবকে বন্দি করে জিজ্ঞাসা করে–

–তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?

–হ্যাঁ।

–তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল?

–আমি শুনতে পাচ্ছি না, কী বলছ?

মুসাইলামা তার ডান হাত কেটে দিল

এভাবেই সে বারবার একই প্রশ্ন করতে থাকল আর হাবীব একই উত্তর দিতে থাকলেন। প্রত্যেকবার উত্তরের পর পাষণ্ড তাঁর একেকটি অঙ্গ কেটে ফেলছিল। দুই হাত দুই পা কেটে ফেলার পরও তাঁর অবিচলতা দেখে মিথ্যুক মুসাইলামা তাঁর জিহ্বা কেটে আবার জিজ্ঞাসা করল– তুমি কি আমাকে রাসূল বলে বিশ্বাস কর? হাবীব ইবনে যায়েদ দৃঢ়তার সাথে মাথা নেড়ে অস্বীকার করলেন তার নবুওয়াতকে। 'পাষাণ গলে যাবে' এমন কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করেও অটল, অনঢ় ঈমান নিয়ে অবশেষে

তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন। ইন্না..লিল্লা..হি ওয়া ইন্না..ইলাইহি রা..জিউ..ন।

* * *

হাবীব ইবনে যায়েদের ভয়াবহ মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছানো হল তাঁর মা নাসীবা আল্ মাযেনিয়্যার কাছে। তিনি সব শুনে বেশি কিছু বললেন না। বললেন সামান্য একটু কথা–

من أجل مثل هذا الموقف أعددته
و عند الله احتسبته
لقد بايع الرسول صلى الله عليه و سلم ليلة العقبة صغيرا...
و وفى له اليوم كبيرا...

এমন একটি ভূমিকার জন্যই আমি তাকে গড়েছিলাম
আমি আল্লাহর ফয়সালায় তুষ্ট, আমি প্রতিদান চাই তাঁর কাছেই।
শৈশবে সে "আকাবার রাতে" শপথ নিয়েছিল প্রিয়নবীজীর হাতে।
অনেক বড় হয়ে আজ সে সেই অঙ্গীকারের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ঘটালো।

তবে আল্লাহ তাআলা যদি মুসাইলামার ওপর আমাকে ক্ষমতা দেন তাহলে আমি তার মেয়েদের দিয়ে তার গালে চপেটাঘাত করব ...

* * *

নাসীবা রাযিয়াল্লাহু আনহা যেই দিনটি দেখার আকাঙ্খায় ছিলেন, সে দিনটির আগমন খুব বেশি বিলম্বিত হল না
হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে মিথ্যা নবুওয়াত দাবীদার ভণ্ড মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার আহ্বান এসে গেল
মুসলিম বাহিনী পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো সেই লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে। সেই বাহিনীর মধ্যে শামিল হলেন অসামান্য সাহসী যোদ্ধা উম্মে 'উমারা ও তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ।

দুইদল যখন যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি দাঁড়াল, বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। সেই যুদ্ধের মাঠে মুসলিম বাহিনীর ক্ষুদ্র একটি দল খুঁজতে থাকল শুধু মুসাইলামাতুল কাযযাবকে। এই দলের শীর্ষে ছিলেন উম্মে 'উমারা যাঁর লক্ষ্য শহীদ পুত্রের বদলা নেওয়া

আরো ছিলেন ওয়াহ্শী ইবনে হারব্, 'ওহোদের' যুদ্ধে হযরত হামযার হত্যাকারিনী তাঁর আকাঙ্খা ছিল—মুশরিক অবস্থায় শ্রেষ্ঠতম এক ব্যক্তি (হযরত হামযা রাযি.) কে হত্যার কাফ্ফারা হিসেবে মুমিন অবস্থায় নিকৃষ্টতম এই লোকটিকে হত্যা করা।

* * *

উম্মে 'উমারা মুসাইলামার কাছে পৌঁছতে সক্ষম হলেন না, এই ময়দানে তাঁর একটি হাত কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে শক্তিহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে

কিন্তু ওয়াহ্শী ইবনে হারব্ এবং রাসূলের তরবারি রক্ষক সাহাবী আবু দুজানা পৌঁছে গেলেন মুসাইলামার কাছে এবং দু'জন মিলে তার উপর আক্রমণ করলেন যৌথভাবে

ওয়াহ্শী বল্লমের তীক্ষ্ম ফলাবিদ্ধ করলেন

আর আবু দুজানা হানলেন তরবারির চরম আঘাত ...

ফলে চোখের পলকে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে নির্জীব হয়ে।

* * *

উম্মে 'উমারা 'ইয়ামামা'র যুদ্ধের পর মদীনায় ফিরে এলেন একটি মাত্র হাত আর একমাত্র পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে।

অন্য শহীদ হাতটির জন্য তিনি আল্লাহর কাছে প্রতিদান প্রত্যাশা করেন, যেমন প্রত্যাশা করেন ইতিপূর্বের শহীদপুত্রের জন্য।

কেন ঐ দু'টোর প্রতিদান প্রত্যাশা করবেন না?

তিনি কি বলেন নি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে—

'আমাদের জন্য দু'আ করুন, আমরা যেন জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু‘আ করেছিলেন–

‘হে আল্লাহ! তুমি ওদেরকে জান্নাতে আমার সঙ্গী করে দাও

উম্মে ‘উমারা বললেন–

এরপর এই দুনিয়ায় আমার যত বিপদই হোক, যত কষ্ট আসে আসুক, আমার আর কোন ভয় নেই, কোন পরোয়া নেই ...

* * *

আল্লাহ তা‘আলা উম্মে ‘উমারার প্রতি যেন খুশি হয়ে যান এবং তাকে খুশি করে দেন, কারণ তিনি ছিলেন মুমিন নারীদের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত

অবিচল ও অটল জিহাদকারিনীদের মাঝে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া

রমলা বিনতে আবু সুফিয়ান

'উম্মে হাবীবা (রমলা) আল্লাহ ও রাসূলকে অন্য সকল কিছুর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন আর কুফরীর জীবনে ফিরে যাওয়াকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন যেমন মানুষ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে।'

–ঐতিহাসিক বৃন্দ

আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের কখনো মনে হয়নি যে, তার সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার অথবা তার মতামতের বিরোধিতা করার সাধ্য কুরাইশী কোন সদস্যের থাকতে পারে। কারণ তিনিই মক্কার একমাত্র অবিসংবাদিত নেতা, তিনিই এমন সর্দার–মক্কার সকল মানুষ যার আনুগত্য করে দ্বিধাহীনভাবে।

কিন্তু তারই মেয়ে রমলা যার ডাকনাম উম্মে হাবীবা, এই বদ্ধমূল ধারণাকে একেবারে মিথ্যা প্রমাণ করে দিলেন। সেটা এই ভাবে যে, তিনি সোজাসুজি অস্বীকার করলেন পিতার দেব-দেবীকে মানতে, পূজা করতে। তিনি ও তার স্বামী উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ঈমান গ্রহণ করলেন এক ও লা-শরীক আল্লাহর প্রতি এবং নবী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ এর রিসালাত (তাঁর রাসূল হওয়া) কে সত্য বলে স্বীকার করলেন।

আবু সুফিয়ান নিজের সকল শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে নিজের মেয়ে ও জামাতাকে নিজের ও পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা চালালো। কিন্তু সফল হলো না। কেননা উম্মে হাবীবার কলবের জমিনে ঈমানের যে চারা শিকড় ছড়িয়ে মজবুত ও দৃঢ় হয়েছে, তার মূলোৎপাটন আবু সুফিয়ানের ক্রোধের ঘূর্ণিঝর দ্বারাও সম্ভব নয়। আবু সুফিয়ানের রাগ তাঁর ঈমানী বৃক্ষকে উপড়ে ফেলতে পারল না।

* * *

উম্মে হাবীবার ইসলাম গ্রহণের কারণে আবু সুফিয়ান ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলো। কারণ সে বুঝতে পারছিলো না, কোন মুখ নিয়ে সে কুরাইশদের সামনে যাবে। নিজের মেয়েকেই নিজের অনুগত বানাতে পারলো না। পারলো না তাকে মুহাম্মাদের অনুসরণ থেকে ফেরাতে।

* * *

কুরাইশের লোকজন যখন দেখল যে, আবু সুফিয়ান নিজের মেয়ে ও জামাতার উপর ক্ষিপ্ত, তখন তাদের স্পর্ধা বেড়ে গেল। তারা ঐ দু'জনের জীবনকে ফেলে দিল গভীর সঙ্কটে। নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে তাঁদের ঠেলে দিল দুর্বিষহ জীবনে। অবশেষে তাঁদের এ ধারণা সৃষ্টি হল যে, মক্কায় টিকে থাকা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের জন্য হাবসায় হিজরতের অনুমতি দিলেন, তখন আবু সুফিয়ানের কন্যা রমলা ও তাঁর শিশুকন্যা হাবীবা ও স্বামী উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ছিলেন নিজেদের দীন রক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় হিজরতকারীদের সাথে বরং নিজেদের ঈমান হেফাজতের লক্ষ্যে নাজাশীর আশ্রয়ে গমনকারীদের শীর্ষে।

* * *

কিন্তু আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং অন্য কুরাইশী নেতাদের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া খুবই কঠিন!। হাবশায় গিয়েও স্বস্তির স্বাদ নেওয়া তাঁদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ল।

তারা নাজাশীর নিকট পাঠাল কয়েকজন দূত। যেন তাদের মাধ্যমে নাজাশীকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা যায় এবং ওঁদেরকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর দাবী জানানো যায়।

নাজাশী দূতদের মুখে সব কথা শুনে তাঁর দেশে হিজরত করে আসা মুসলিম নেতৃবৃন্দকে ডেকে পাঠালেন। তাঁদের কাছে ইসলামের হাকীকত জানতে চাইলেন, জানতে চাইলেন ঈসা ইবনে মারয়াম ও তাঁর মা সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাস। সবশেষে এও বললেন যে, তোমাদের নবীর

প্রতি অবতীর্ণ কিতাব থেকে আমাকে কিছুটা শোনাও।

তাঁরা যখন ইসলামের হাকীকত সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং তাঁকে কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে শোনালেন। তিনি এমনভাবে প্রভাবিত হলেন যে, চোখের পানিতে তার দাড়ি ভিজে গেল। তিনি তাঁদেরকে বললেন–

'যে বাণী তোমাদের নবী মুহাম্মাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যে বাণী নিয়ে এসেছিলেন ঈসা ইবনে মারয়াম, উভয় বাণী একই উৎস থেকে আগত।'

এরপর এক ও অদ্বিতীয়, লা-শরীক আল্লাহর প্রতি তাঁর ঈমানের ঘোষণা দিলেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে তিনি সত্য বলে বিশ্বাস করেন, সেকথাও সবাইকে জানালেন।

সাথে সাথে একথাও ঘোষণা করলেন যে, তাঁর দেশে আগত মুসলিমদের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাবেন। তাঁদের সাহায্য অব্যাহত রাখবেন। যদিও তাঁর অন্য নেতৃবর্গ ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তাঁদের পুরাতন খৃস্ট্রীয় মতবাদের ওপর অবিচল থেকে যায়।

* * *

উম্মে হাবীবা ভাবলেন, দীর্ঘ ঝঞ্ঝাট পেরিয়ে এবার হয়ত তিনি দেখা পাবেন মেঘ মুক্ত নির্মল দিবসের। তিনি মনে করলেন, দীর্ঘ ক্লান্তিকর সফর হয়ত তাকে নিরাপদ এক অঙিনায় পৌঁছে দিয়েছে ...

এই সব ভাবনার কারণ এই যে, তিনি জানতেন না অজ্ঞাত তাকদীর তাঁর জন্য আরো কত কী লুকিয়ে রেখেছে ...

* * *

অসীম হিকমত ওয়ালা ও প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহ চাইলেন উম্মে হাবীবার এমন কঠিন পরীক্ষা নিতে যেখানে বুদ্ধিদীপ্ত পুরুষদেরও বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, যেখানে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিচক্ষণদের তীক্ষ্মতাও ভোঁতা হয়ে যায়।

চাইলেন ভয়াবহ অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে তাকে সফলতার শীর্ষচূড়ায় পৌঁছাতে

কোন এক রাতে উম্মে হাবীবা বিছানায় গেলেন, তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তার স্বামী উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ এক প্রমত্ত সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাকে ঢেকে দিচ্ছে গভীর কালো অন্ধকার; তার অবস্থা নিকৃষ্টতর

তিনি ঘুম থেকে জাগলেন প্রচন্ড ভয় ও উত্তেজনায় অস্থির হয়ে

এই স্বপ্নের কথা স্বামীকে অথবা অন্য কাউকে তিনি বলতে চাইলেন না। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন খুব শীঘ্রই বাস্তবায়িত হয়ে গেল, কেননা সেই কালো অশুভ রাত্রির পর একটি দিনও পার হল না, ইতিমধ্যেই উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ইসলাম ত্যাগ করে খৃস্টান হল

এরপর সে মদের দোকানে উপুড় হয়ে পড়ে থাকল, আসক্ত হল সকল নিকৃষ্টতার জননীতে (মদে)। সারাক্ষণ শুধু মদ গিলতে থাকল।

স্ত্রীর নিকট তুলে ধরল দু'টি বিকল্প

হয় নিতে হবে তালাক

অথবা হতে হবে খৃস্টান

* * *

উম্মে হাবীবা দেখলেন– তার সম্মুখে তিনটি পথ খোলা ঃ

এক: স্বামীর কথা মেনে নেওয়া যিনি এখনো খৃস্টধর্ম গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি অব্যাহত রেখেছেন, তাকে মানলে হতে হবে ইসলাম ত্যাগী-মুরতাদ। (নাউযুবিল্লাহ) পরিণতি হবে দুনিয়ার লাঞ্ছনা আর আখিরাতে আযাব।

এটি এমন এক বিষয় যা কোন ভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, লোহার চিরুনি দিয়ে শরীরের গোস্ত আঁচড়ে তুলে ফেললেও তিনি ঐ প্রস্তাবে সাড়া দেবেন না।

দুই: মক্কায় পিতার কাছে ফিরে যাওয়া, যিনি এখনো শিরকের দুর্গ। ফলে তার কাছে বাস করলে দীন হবে পরাভূত, জীবন হবে পরাজিত।

তিন: থেকে যাওয়া এই হাবশার দেশে, একাকী, স্বদেশ, স্বজন ও

সংসারহীন এক ভবঘুরে হয়ে।

সব বিকল্প ত্যাগ করে তিনি গ্রহণ করলেন আল্লাহ তাআলার রেজা ও সন্তুষ্টি

তিনি সংকল্প করলেন, স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যতদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ফয়সালা না আসে তিনি থাকবেন এই হাবশাতেই।

* * *

উম্মে হাবীবার এন্তেজার ও অপেক্ষার কষ্ট দীর্ঘ হল না।

পূর্ব স্বামী খৃস্টান হওয়ার পর পরই মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ইদ্দত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই এসে গেল প্রতীক্ষিত স্বস্তির সমাধান, এসে গেল বাঁধভাঙ্গা আনন্দের জোয়ার

তাঁর বিষণ্ণ গৃহের ছাদে এসে বসল দীর্ঘমেয়াদী সুখ সবুজ ডানা মেলে

রূপালী আলোর মিষ্টি হাসিমাখা কোন এক শুভ্র-স্নিগ্ধ সকালে তাঁর দরজার কড়ায় নাড়া পড়ল। তিনি যখন খুলে দিলেন দরজা, নাজাশী বাদশার খাস খাদেমা 'আবরাহা' কে দেখে চমকে উঠলেন।

'আবরাহা' তাঁকে প্রফুল্লতার হাসি মেখে সৌজন্যপূর্ণ ভাষায় অভিবাদন জানালেন। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ভেতরে গিয়ে জানালেন–

বাদশা আপনাকে সালাম দিয়েছেন, তিনি আপনাকে জানাচ্ছেন যে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ আপনাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছেন ...

বাদশার কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি তাকে উকিল নিযুক্ত করেছেন যেন তাঁর সঙ্গে আপনার আকদ সম্পন্ন করে দেন অতএব আপনি আপনার পছন্দের কাউকে উকিল মনোনীত করুন।

* * *

আনন্দের আতিশয্যে উম্মে হাবীবার উড়াল দিতে ইচ্ছা হল। মন চাইলো চিৎকার করে বলতে– তোকে আল্লাহ সুখ দিয়েছে রে– সুখ

তিনি তাঁর অলঙ্কারাদি খুলতে শুরু করলেন। হাতের দুইটি বালা খুলে আবরাহাকে দিলেন এরপর পায়ের মল খুলে দিলেন, দুল, আঙটি সব দিলেন

তিনি যদি দুনিয়ার সকল সম্পদের মালিক হতেন, তাহলে সে মুহূর্তে তাও তাকে দিয়ে দিতেন।

এই সব কিছু দেওয়া শেষ করে তিনি বললেন– আমি খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আছকে আমার উকিল নিযুক্ত করলাম। এখানে তিনিই আমার সর্বাধিক কাছের মানুষ।

* * *

শহরের উপকণ্ঠে, হাবশার শ্যামল-ঘেরা একটি বাগানের দিকে উঁকি মেরে থাকা সবুজবৃক্ষ শোভিত একটি টিলায় অবস্থিত নাজাশীর শাহী মহল

জমকালো আসবাবে ঠাসা, চকচকে পিতল নির্মিত প্রদীপের আলোয় আলোকিত, বর্ণিল পুষ্পের নকশা অঙ্কিত, সুসজ্জিত ও সুপ্রশস্ত এক মিলনায়তনে সমবেত হয়েছেন হাবশায় অবস্থানরত শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম, যাঁদের নেতৃত্বে রয়েছেন জা'ফর ইবনে আবী তালেব, খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আছ, আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্‌সাহমী প্রমুখ। তাঁরা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ানের আকদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন।

মজলিসের সভাপতিত্ব করছেন নাজাশী। তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন–

প্রতাপশালী, পরাক্রমশালী, নিরাপত্তাদাতা ও মহাপবিত্র আল্লাহর প্রশংসা করছি, আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইবাদাতের উপযুক্ত আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই, আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনিই সেই মহান নবী যাঁর সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে গেছেন ঈসা ইবনে মারয়াম।

আম্মাবাদ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আমাকে বলেছেন তাঁর সঙ্গে উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ানকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিতে। আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর নায়েব হিসাবে আল্লাহর বিধান ও তাঁর রাসূলের আদর্শের ভিত্তিতে চারশত স্বর্ণমুদ্রা মহর প্রদান করলাম

তিনি খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আছ এর সম্মুখে দীনার সব ঢেলে দিলেন। এবার খালিদ দাঁড়িয়ে বললেন–

সকল প্রকার প্রশংসার একমাত্র উপযুক্ত আল্লাহ, আমি তাঁরই প্রশংসা করছি, একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি, তাঁর কাছেই ক্ষমা চাচ্ছি, তওবা করছি তাঁর কাছেই, সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন সত্য ও সঠিক পথের দিশা; দীন ইসলাম দিয়ে, কাফেররা না চাইলেও ঐ দীনকে সকল বাতিল ধর্মের উপর বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে।

হামদ ও সালাতের পর...

আমি প্রিয়নবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমার মুআক্কেলা উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ানকে তাঁর বিবাহে প্রদান করলাম। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের জীবনে এই স্ত্রীর মাধ্যমে বরকত প্রদান করুন।

উম্মে হাবীবাকে শুভেচ্ছা, তাঁর জন্য আল্লাহ তাআলার এই শুভ সমাধানের কারণে

এরপর মহরের সব অর্থ তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি উঠতে চাইলেন, তাঁর কারণে সঙ্গীরাও উঠতে চাইলে, নাজাশী তাঁদেরকে বললেন–

'আপনারা দয়া করে বসুন, নবীদের সুন্নত হল বিয়ের পর আপ্যায়ন করা।'

তাঁদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলেন। সবাই খেয়ে বিদায় হলেন।

* * *

উম্মে হাবীবা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ

যখন সব অর্থ আমার হাতে এসে গেল, সুসংবাদ দাতা 'আবরাহা'র জন্য পাঠালাম পঞ্চাশ মেছকাল স্বর্ণ। তাকে জানালাম–

সুসংবাদ প্রদানের সময় দিয়েছিলাম অতি সামান্য কারণ তখন আমার কাছে দেওয়ার মত ওগুলো ছাড়া আর কিছুই ছিল না

কিছুক্ষণের মধ্যেই 'আবরাহা' এসে হাজির হলেন। পূর্বের ও পরের সব কিছু আমার নিকট ফেরৎ দিয়ে বললেন–

বাদশা আমাকে ওয়াদা করিয়েছেন যেন তোমার থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করি।

তিনি স্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের কাছে যত সুগন্ধি আছে সব তোমাকে পাঠিয়ে দিতে।

পরের দিনই তিনি আমার কাছে নিয়ে আসলেন জাফরান, চন্দন ও আম্বরসহ বিভিন্ন আতর ও সুগন্ধি। আমাকে সবগুলো দিয়ে বললেন–

–তোমার কাছে আমার একটি বিশেষ কথা আছে ...

–কী সেটা?!

–আমি ইসলাম কবুল করেছি, দীনে মুহাম্মাদের এত্তেবা-অনুসরণ করি, সুতরাং তুমি নবীজীর কাছে আমার সালাম বলবে। এ খবরটিও জানাতে ভুলবে না যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি ...

এরপর আমাকে প্রস্তুত করে দিলেন।

* * *

আমাকে নিয়ে যাওয়া হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাত যখন হল, বিয়ের প্রস্তাব সংক্রান্ত সব খুঁটিনাটি তাঁকে খুলে বললাম। আর 'আবরাহা'র সঙ্গে আমি যা যা করেছি তাও বললাম। তাঁর সালামও পৌঁছে দিলাম।

নবীজী খুশী হলেন তাঁর সংবাদে, সালামের জবাবে বললেন–

و عليها السلام و رحمة الله و بركاته

(ওয়া আলাইহাস্ সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু)

গুমাইছা বিনতে মিলহান

(উম্মে সুলাইম)

"আমরা কখনো কোন নারীর কথা শুনিনি, যার মোহর উম্মে সুলাইমের চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ, কেননা তাঁর মোহর ছিল 'ইসলাম'।"

—মদীনাবাসীদের মন্তব্য

গুমাইছা বিনতে মিলহান এর বয়স ছিল ইসলামের আলো জমিনে বিস্তৃতির সময় প্রায় চল্লিশ বছর। তাঁর স্বামী মালিক ইবনে নাযর তাঁকে দিয়েছিলেন প্রলম্বিত প্রেম আর নিবিড় ভালাবাসা, যা তাঁর জীবনকে করেছিলো মনোরম, সহানুভূতিশীল। করে ছিল স্বচ্ছল স্বাচ্ছন্দময়, মদীনার চেনা-জানা লোকেরা ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ত ভাগ্যবান সুখী স্বামীর প্রতি, তার জীবন সঙ্গিনীর বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও আনুগত্যের কারণে।

একদিন মক্কা নগরীর দাঈ (আল্লাহর পথে আহ্বানকারী) মুছ'আব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাত ধরে হেদায়াতে মুহাম্মাদীয়ার প্রথম কিরণ পৌঁছে গেল মদীনায়। সেই কিরণের ছোঁয়া পেয়ে গুমাইছার অন্তর উন্মুক্ত হলো যেমন পুষ্পদ্যানের ফুল কলিরা প্রস্ফুটিত হয় প্রভাতরশ্মির ছোঁয়ায়। তিনি বিলম্ব করলেন না একটুও, দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন, যে সময় মদীনার সমাজে মুসলিমদের হাতে গণনা করা যেত

এরপর চিরবিশ্বস্ত স্ত্রী প্রাণাধিক প্রিয় স্বামীকে দাওয়াত দিলেন তাঁর সঙ্গে ঐশী ঝরনা থেকে স্বচ্ছ-নির্মল, সুমিষ্ট পানি পান করে পরিতৃপ্ত হতে এবং ঈমানের যে সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছেন তা দ্বারা ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করতে

কিন্তু মালিক ইবনে নাযর এর অন্তর এই নতুন দীনের ব্যাপারে আশ্বস্ত

হয় নি। এই দীন তার ভালো লাগে নি। উল্টা তিনি সহধর্মিনীকে আহ্বান জানালেন ইসলাম ছেড়ে বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে আসতে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই আপন আপন অবস্থানে অনড় থাকলেন। মানুষের কাছে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াটা যেমন, গুমাইছা রাযিয়াল্লাহু আনহার নিকট ঈমান গ্রহণের পর পুনরায় কুফরীতে প্রত্যাবর্তন তেমনই কঠিন বিষয়।

মালিক ইবনে নাযার করত গোঁড়ামী, বলত-'পূর্ব পুরুষের ধর্ম' 'বাপ-দাদার ধর্ম' এটা আমি ছাড়তে পারব না। তারচেয়ে বরং তুমিই ফিরে আস।

গুমাইছা রাযিয়াল্লাহু আনহা যুক্তি-তর্কে ছিলেন শক্তিশালী, ধারালো যুক্তি দিয়ে তিনি স্বামীকে লা-জবাব করে দিতেন। তাছাড়া তাঁর দাওয়াতের মধ্যে থাকত হক ও সত্যের নূর, যা স্বামীর দুর্বল ও ভিত্তিহীন বক্তব্যকে নাস্ত-নাবূদ করে ছাড়ত

মালিকের ছিল একটি কাঠের মূর্তি যার সে নিয়মিত পূজা করত। এ ব্যাপারে গুমাইছা তাকে বলতেন–

তুমি কি মাটি থেকে উৎপন্ন গাছের একটি ডালের পূজা করতে থাকবে, যে মাটিকে তুমি দু'পা দিয়ে মাড়াও, যে মাটিতে তুমি হাগু–মুতু কর?

তুমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে পূজা করবে একটি তক্তার, যাকে করাত ও রেঁদা দ্বারা সমান করেছে মদীনার বাজারের কোন এক হাবশী ছুতোর?

স্ত্রীর এরূপ যুক্তিপূর্ণ আক্রমণে টিকতে না পেরে স্বামী মদীনা ছেড়ে পালাল, দিশাহারা হয়ে ঘুরে ফিরে শামে (সিরিয়ায়) গিয়ে পৌঁছল। সেখানে গিয়ে বেশিদিন বাঁচেনি, শীঘ্রই শিরকের বিশ্বাস নিয়েই প্রাণ ত্যাগ করল।

* * *

মদীনায় গুমাইছার বৈধব্যের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। বহু পুরুষ তাকে বিবাহের স্বপ্ন মনে মনে পুষতে থাকল। ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কায় তারা কেউ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটাতে সাহস করল না।

তবে যায়েদ ইবনে ছাহাল, ডাকনাম আবু তালহা, তার আশা জাগল যে, তারা দু'জনই 'নাজ্জার' গোত্রীয়– এই এতটুকু সম্পর্কের খাতিরে তিনি হয়ত সম্মত হবেন।

* * *

আবু তালহা গেল গুমাইছার গৃহে। তাঁর ডাকনাম ধরে ডেকে এই বলে প্রস্তাব দিল–

হে উম্মে সুলাইম! আমি তো তোমার কাছে বড় আশা করে প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

তিনি বললেন–

আবু তালহা! আল্লাহর কসম! তুমি এমন মানুষ নও যাকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তুমি কাফের পুরুষ আর আমি মুসলিম নারী, তোমার সাথে আমার বিবাহ সম্ভব নয়। তবে তুমি যদি ইসলাম কবুল কর, তাহলে সেটাই হবে আমার বিবাহের মহর। তোমার কাছে তোমার ইসলাম ছাড়া আর কোন মোহরানা আমি চাইব না।

তিনি জবাব দিলেন–

বিষয়টি নিয়ে আমাকে একটু ভাবতে দাও। এই বলে বিদায় নিলেন

পরের দিন ফেরৎ এসে বললেন–

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه وَ أَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا عَبْدُه وَ رَسُوْلُه

আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই, তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

গুমাইছা বললেন–

তুমি যখন ইসলাম কবুল করে নিলে আর কোন আপত্তি আমার নেই। আমি এখন সম্পূর্ণ রাজি তোমার প্রস্তাবে। মানুষের মুখে মুখে চালু হয়ে গেল যে 'আমরা কখনো কোন নারীর কথা শুনিনি, যার মোহরানা উম্মে সুলাইমের চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ, কারণ তার মোহরানা ছিল ইসলাম।'

* * *

আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু সুখী হলেন উম্মে সুলাইমের মহৎ চরিত্র ও উন্নত স্বভাবে। সেই সুখ ষোলকলায় পূর্ণ হল যখন স্ত্রী প্রসব করলেন একটি পুত্রসন্তান। যাকে দেখে জুড়িয়ে গেল তাঁর দুই চোখ, প্রশান্তিতে ভরে উঠল তাঁর হৃদয়।

কিন্তু এরই মাঝে এক সফরের প্রস্তুতির সময় ছোট্ট শিশুটি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল, তিনি তাতে অস্থির হয়ে সফরের ব্যাপারে দ্বিধা করতে করতেও বেরিয়ে পড়লেন।

সফরের সামান্য অনুপস্থিতিতে সতেজ ডালটি দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ল। (অর্থাৎ শিশুটি মারা গেল) তাকে মাটি দিয়ে ঢেঁকে দেওয়া হল। উম্মে সুলাইম সকলকে সাবধান করে বলে রাখলেন–

তোমরা কেউ পুত্রের মৃত্যু সংবাদ আবু তালহাকে শোনাবে না। যা বলার আমিই তাকে বলব।

* * *

আবু তালহা ফিরে আসলেন সফর থেকে। উম্মে সুলাইম মুখের মিষ্টি হাঁসি আর প্রসন্নতা দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রথমেই তিনি পুত্রের ব্যাপারে জানতে চাইলে বললেন–

যেমনটি তুমি দেখেছিলে তেমন নয়, এখন সে অনেক আরামে

তাঁকে রাতের খাবার খাওয়ালেন। উষ্ণ অন্তরঙ্গতা দিয়ে তাঁকে সুখ ও তৃপ্তি দান করলেন। যখন তিনি বুঝলেন যে, স্বামী পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত তখন বললেন–

হে আবু তালহা! একটু চিন্তা করে বলো– যদি কোন ঋণদাতা ঋণ ফেরৎ চায় তাহলে গ্রহীতার কি উচিৎ ফেরৎ দিতে আপত্তি করা?

–মোটেও উচিৎ নয়। স্বামী নিশ্চিন্তে জবাব দিলেন।

–আল্লাহ যে সন্তান তোমাকে দান করেছিলেন তা তিনি ফেরৎ নিয়েছেন। আপত্তি না করে ছবর করলে এই সন্তানের জন্য তিনি তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন।

আবু তালহা তখন আল্লাহর ফয়সালাকে সন্তোষ ও সমর্পণের সঙ্গে মেনে নিলেন। সকাল হলে চলে গেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের দরবারে, তাঁকে শুনালেন উম্মে সুলাইমের সব কথা। ঘটনার বিশদ বিবরণ শুনে তিনি দু'জনের জন্যই দু'আ করলেন যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে হারানো সন্তানের চেয়ে উত্তম সন্তান দান করেন এবং তাঁদের দু'জনের জীবনের মধ্যে বরকত দান করেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলের দু'আ কবুল করলেন। উম্মে সুলাইমের পেটে সন্তান আসল। গর্ভের মেয়াদ পূর্ণ হল। সে সময় তিনিও এক সফর থেকে প্রিয়নবী ও স্বামীর সঙ্গে মদীনায় ফিরছিলেন।

যখন মদীনার কাছাকাছি পৌঁছলেন, শুরু হল প্রসব বেদনা। আবু তালহা থেমে গেলেন স্ত্রীর সঙ্গে। নবীজী রাত ঘনিয়ে আসার পূর্বেই মদীনায় পৌঁছার উদ্দেশ্যে চলতেই থাকলেন। আবু তালহা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—

হে পরওয়ারদেগার! তুমি তো জান তোমার প্রিয় রাসূলের সঙ্গে বের হওয়া এবং তাঁর সঙ্গেই ফেরা আমার কতটা পছন্দনীয়। এই মুহূর্তে আমি কেন সেটা করতে পারছি না, কী আমার বাধা তা তো তুমি দেখছ।

এ কথা শুনে উম্মে সুলাইম বললেন—

হে আবূ তালহা! পূর্বে প্রসবের পূর্বক্ষণে যে ব্যথা হয়েছে এখনো সেরূপ কোন ব্যথা অনুভব করছি না। হয়ত এখনো দেরি আছে। সুতরাং আমাকে নিয়ে চল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত থেকে পিছে পড়ে থেকো না।

তারা চলতে শুরু করলেন, মদীনায় পৌঁছার পর প্রসব করলেন এক পুত্র সন্তান। তিনি আশপাশের সকলকে বললেন—

সর্বপ্রথম তাকে রাসূলের কাছে নিতে হবে, তার পূর্বে ওকে এক ফোটা দুধও খাওয়ানো হবে না। প্রভাতে শিশুটির বড় ভাই আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু কোলে করে নিয়ে গেলেন রাসূলের নিকট। তিনি দেখেই বললেন—

সম্ভবত: উম্মে সুলাইম সন্তান প্রসব করেছে।

আনাস জবাব দিলেন হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! শিশুটিকে তাঁর কোলে তুলে দিলেন। তিনি মদীনার একটি আজওয়া খেজুর চিবিয়ে নরম করে

শিশুটির মুখে দিলেন, শিশু বাচ্চা জিহবা নেড়ে ঠোঁট চেটে চেটে খেল। প্রিয় নবীজী পবিত্র হাতে তার মুখে আদর মেখে দিলেন। তার নাম রাখলেন 'আব্দুল্লাহ'।

পরবর্তীকালে এই আব্দুল্লাহর ঔরসে জন্ম নিয়েছেন ইসলামের দশজন শ্রেষ্ঠ আলেম সন্তান।

* * *

উম্মে সুলাইম প্রিয়নবীকে এতো গভীর ভালবাসতেন যা মিশে গিয়েছিল তাঁর অস্থি-মজ্জায়, পৌঁছে গিয়েছিল হৃদয়ের গভীর প্রকোষ্ঠে।

প্রিয়নবীজীর প্রতি তাঁর তীব্র ভালবাসার কথা বর্ণনা করেছেন খোদ তাঁর পুত্র আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন–

একদা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন, কপাল মুবারক থেকে ঘাম ঝরছিল দেখে আমার মা একটি শিশি নিয়ে আসলেন এবং ঐ শিশিতে তাঁর মুবারক ঘাম ভরতে লাগলেন। প্রিয়নবীজীর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বললেন–

–এটা কী করছ উম্মে সুলাইম?!

–আপনার মুবারক ঘাম ধরে রাখছি, সুগন্ধির মধ্যে মেশালে সেটা পরিণত হবে সর্বোত্তম সুগন্ধিতে।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড ভালবাসার প্রমাণ রয়েছে প্রচুর। একটি প্রমাণ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। সেটি এই যে, তার পুত্র আনাস ইবনে মালিক এর মাথার অগ্রভাবে ছিল একগুচ্ছ চুল যা ঝুলে থাকত কপালে। সেটা লম্বা হয়ে গেলে তাঁর স্বামী কেটে ফেলতে চাইলেন। তিনি তাতে বাধা দিলেন এই কারণে যে, প্রিয় নবীজীর সামনে আনাস যতবারই গেছে, ততবারই তিনি আদর করে

তার মাথায় হাত মুবারক বুলিয়েছেন আর তার ঝুলন্ত কেশগুচ্ছ স্পর্শ করেছেন।

* * *

উম্মে সুলাইমের উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর বিবরণ এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয় যে, তিনি ছিলেন খাঁটি ও মজবুত ঈমানের অধিকারিনী পাক্কা মুমিন নারী, তীক্ষ্মতা ও দুরদর্শিতা সম্পন্ন একজন বুদ্ধিমতি নারী, সর্বোত্তম শ্রেণীর একজন স্ত্রী, একজন আদর্শ মা

ঐসব কিছুর উর্ধ্বে ছিল এই যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর পথে সংগ্রামী এক অকুতোভয় নারী। যুদ্ধক্ষেত্রের কতনা ধূলা তাঁর দুই শ্বাসযন্ত্রে (নাকে) ঢুকেছে!

আহত মুজাহিদদের রক্ত মুছতে গিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতে গিয়ে কতবারই না রাঙা হয়ে উঠেছে তাঁর দু'হাতের আঙুলগুলো

কতবার আল্লাহর পথে প্রাণদানকারীদের পিপাসার্ত কণ্ঠে ঢেলে দিয়েছেন সুপেয় পানি

তুলে দিয়েছেন তাদের সামান মেরামত করেছেন তাদের তির আর ধনুক

* * *

'ওহোদ' যুদ্ধে তিনি ও তাঁর স্বামী আবু তালহা শরীক হয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সালাম এর সঙ্গে, সেখানে তিনি ও আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা পানির মশক পিঠে নিয়ে ময়দানে ছুটে বেরিয়েছেন আর আহত ও তৃষ্ণার্তদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

তিনি শরিক হয়েছেন 'হুনাইনের' যুদ্ধেও। সেদিন তিনি (যোদ্ধার মত) হাতে নিয়ে ঘুরছিলেন একটি খঞ্জর (ছুরি), তাঁর স্বামী আবু তালহা অবস্থা দেখে রাসূলের নিকট গিয়ে বললেন–

ইয়া রাসূলুল্লাহ! উম্মে সুলাইমকে দেখুন, খঞ্জর হাতে নিয়ে ঘুরছে।

নবীজী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন–

–এটা কী উম্মে সুলাইম?!

–একটি খঞ্জর, এটা নিয়ে এসেছি কারণ কোন মুশরিক যদি আমার কাছাকাছি এসে পড়ে তাহলে এটা দিয়ে তার পেট ফেঁড়ে ফেলব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাব শুনে হাসতে লাগলেন।

* * *

পাঠক! তুমি কি ভাবতে পার যে, জমিনের ওপর উম্মে সুলাইমের চেয়ে অধিক ভাগ্যবতী এবং অধিক শুভপরিণতি সম্পন্না আর কোন নারী থাকতে পারে? যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

'আমি জান্নাতে প্রবেশ করে সেখানে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম

আমি জিজ্ঞাসা করলাম–

কার পায়ের আওয়াজ? কে এখানে?

ফেরেস্তারা বললেন–

আনাস ইবনে মালিকের মা গুমাইছা বিনতে মিলহান

উম্মে সালামা
(আরবের বিধবা)

'হিন্দ আল্‌মাখযুমিয়্যা একা সালামার মা থাকলেন না, হয়ে পড়লেন সকল মুমিনের মা।'

উম্মে সালমা, কে এই উম্মে সালামা?!
তাঁর পিতা 'মাখযূম' সগোত্রের অন্যতম বিশিষ্ট এক সরদার এবং আরবের হাতে গোণা কয়েকজন দানবীরের মাঝে বিখ্যাত এক দানবীর, এমন কি তাকে বলা হত 'মুসাফিরের পাথেয়', কেননা তার বাড়ি যেতে চাইলে অথবা তার সঙ্গে সফর করলে কারোর পাথেয় লাগত না।
যার নাম আবু উমাইয়া ইবনুল মুগীরা আলকুরাইশী।
তাঁর স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ, ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দশজনের একজন, যার পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী মাত্র আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হাতে গোণা কয়েকজন।
তাঁর নাম হিন্দ কিন্তু ডাকা হত উম্মে সালামা নামে, পরে এই ডাক নামটিই ছাপিয়ে উঠে তাঁর আসল নামটিকে।

* * *

উম্মে সালামা তাঁর স্বামীর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করলেন, ফলে ইসলামের প্রতি অগ্রগামীদের দলে তিনিও হলেন একজন।
যেই মাত্র উম্মে সালামা ও তাঁর স্বামীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল অমনি সৃষ্টি হল কুরাইশের মাঝে চরম উত্তেজনা। তাঁদের উপর শুরু করল চরম অত্যাচার। তাঁদের উপর চাপলো পাষাণ গলিয়ে দেয় এমন দুর্বিষহ আযাব। কিন্তু সকল অত্যাচার ও শাস্তি নীরবে সহ্য করে ঈমানের উপর তাঁরা রয়ে গেলেন অবিচল। বিন্দুমাত্র শক্তিহীন ও দুর্বল

হলেন না, হলেন না ক্লান্ত ও দ্বিধান্বিত।

তাঁদের যন্ত্রণা যখন আরো বৃদ্ধি পেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের অনুমতি প্রদান করলেন 'হাবশায়' হিজরতের। ঐ দু'জন থাকলেন হাবশায় হিজরতকারীদের তালিকার শীর্ষে।

* * *

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও তাঁর স্বামী পারি জমালেন ভীনদেশে, মক্কায় ফেলে গেলেন বিলাসপূর্ণ বাড়ি, উচ্চ মর্যাদা আর বংশের গৌরবগাঁথা। সবকিছু বিসর্জন দিলেন আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার প্রত্যাশায়, আল্লাহর রেজা ও সন্তুষ্টির কাছে সবকিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

উম্মে সালামা ও তাঁর সাথীরা নাজাশীর সার্বিক সহযোগিতা পাওয়া সত্ত্বেও 'অহী'র অবতরণ ক্ষেত্র মক্কার প্রতি এবং হিদায়াতের উৎস প্রিয়নবীর প্রতি হৃদয়াবেগকে দমাতে পারছিলেন না। উম্মে সালামা ও তাঁর স্বামী তো প্রিয়নবীর আকর্ষণে অস্থির হয়ে উঠলেন।

তাছাড়া হাবশায় হিজরতকারীদের নিকট একের পর এক সংবাদ আসতে থাকল যে, 'মক্কায় মুসলিমদের সংখ্যা এখন বৃদ্ধি পেয়েছে', 'হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এবং উমর ইবনুল খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের কারণে মুসলিমরা শক্তিশালী হয়েছেন এবং কুরাইশী অত্যাচারও হ্রাস পেয়েছে'। এসব খবর শুনে মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য কিছু মানুষ অস্থির হয়ে উঠলেন। মক্কার আকর্ষণ তাঁদেরকে টানতে লাগল রাসূলের ভালবাসা তাঁদেরকে কাছে ডাকতে থাকল

উম্মে সালামা ও তাঁর স্বামী হাবশা ছেড়ে মক্কায় ফিরে আসলেন।

* * *

কিন্তু মক্কায় ফিরে এসে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, প্রাপ্ত সংবাদ ছিল অতিরঞ্জিত। হামযা ও উমরের ইসলাম গ্রহণের কারণে মুসলিমগণ যেটুকু সাহস দেখাতে চেয়েছিলেন কুরাইশ সেটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে নজিরবিহীন অত্যাচার চালিয়ে, তাদের বর্তমান অবস্থা আরো

নাজুক, আরো ভয়াবহ।

এমনি সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের অনুমতি দিলেন মদীনায় হিজরতের। উম্মে সালামা ও তাঁর স্বামী সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কুরাইশের নির্যাতন থেকে মুক্তি ও ইসলাম রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁরা থাকবেন হিজরতকারীদের প্রথম সারিতে।

কিন্তু উম্মে সালামা ও তাঁর স্বামীর জন্য হিজরত তত সহজ ছিল না যেমন তারা ভেবেছিলেন। হিজরত করতে গিয়ে তাঁরা মুখোমুখি হলেন এমন কঠিন ও বেদনাদায়ক অত্যাচারের যা রেখে গেল তাঁদের জীবনে ভয়াবহ ও করুণ বিয়োগান্তক স্মৃতি।

চলো উম্মে সালামার মুখ থেকেই শুনি তাঁর সেই সকরুণ স্মৃতির বেদনাময় কাহিনী

কারণ তাঁর বিবরণটাই হবে সর্বাধিক গভীর ও আবেদনময়, তাঁর বর্ণনাই হবে সবচেয়ে আবেগপূর্ণ ও সুক্ষ্ম।

উম্মে সালামা বলেন–

আবু সালামা যখন মদীনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নিলেন তখন একটি উটের ব্যবস্থা করে আমাকে বসিয়ে দিলেন সেটার পিঠে, আমাদের শিশুকন্যা সালামাকে দিলেন আমার কোলে। কোন দিকে না তাকিয়ে তিনি আমাদের উটের রশি ধরে মদীনার পথে যাত্রা শুরু করলেন।

মক্কার সীমানা পার হওয়ার পূর্বেই আমার 'মাখযূম' গোত্রের কিছু লোক আমাদের দেখে পথ আগলে দাঁড়ালো। তারা বলল আবু সালামাকে–

যদি তোমার পরাজয় ঘটে তাহলে তোমার স্ত্রীর কী হবে?

সেতো আমাদের 'মাখযূম' গোত্রের মেয়ে, তাকে আমাদের মাঝ থেকে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে, তোমাকে কিসের ভিত্তিতে এই সুযোগ দিব?!

তারা একসঙ্গে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে ছিনিয়ে নিল তাঁর কাছ থেকে।

আমার স্বামীর বংশের (আব্দুল আসাদ গোত্রের) লোকদের চোখে যেই পড়ল, তারা যেই দেখল আমাকে ও আমার সন্তানকে ছিনিয়ে নেওয়া

হয়েছে তাদের পুত্রের নিকট থেকে অমনি তারাও জড়িয়ে পড়ল এই বিবাদে। তারা বলল–

তোমরা যখন আমাদের ছেলের নিকট থেকে তোমাদের মেয়েকে কেড়ে নিয়েছ, তাহলে তোমাদের এই মেয়ের কাছে আমাদের সন্তানকে রাখতে পারবে না। সে আমাদের সন্তান, তার ব্যাপারে আমাদের অধিকার বেশি।

এই কথা বলেই তারা আমার শিশুকন্যা সালামাকে আমার চোখের সামনেই টানাটানি করে বলপূর্বক কেড়ে নিয়ে গেল।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের ব্যবধানে আমার সাজানো বাগান তছনছ হয়ে গেল। আমি হলাম ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। বিশাল এই পৃথিবীতে একেবারে একাকী এক ভবঘুরে।

আমার স্বামী জান ও ঈমান বাঁচাতে চলে গেলেন মদীনায়

আমার সন্তানকে আমার কোল থেকে কেড়ে নিল আমার শ্বশুর গোত্র 'আব্দুল আসাদ'।

আর আমি, আমার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল আমারই বংশের লোকেরা। আমাকে আটকে রাখল তারা

আমাকে, আমার স্বামীকে আর আমাদের সন্তানকে আলাদা করে ফেলা হল অল্প সময়ের মধ্যে।

সেই দিনের পর থেকে প্রতিটি সকালে আমি বালুর সেই উপত্যকায় যাই, প্রতিদিনই গিয়ে বসে থাকি সেই স্থানটিতে যা আমার করুণ কাহিনীর প্রত্যক্ষদর্শী। সেই বিশেষ সময়ের চিত্রগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কল্পনায় দেখতে থাকি যা আমার স্বামীর ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদের দেওয়াল খাড়া করে দিয়েছে। আমি সেখানে বসে বসে বিলাপ করতে থাকি রাতের অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত।

এভাবে আমি কাটালাম দীর্ঘ প্রায় একটি বছর। একদিন আমার শ্বশুর গোত্রের এক ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে, আমার দূরবস্থা দেখে তার হৃদয় কোমল হল, আমার জন্য তার মনে জাগল করুণা। ফলে সে গিয়ে ধরল আমার গোত্রের লোকদের। বলল–

তোমরা কি এই বেচারীকে ছেড়ে দিতে পার না! এমনিতেই তো তাকে স্বামী-সন্তান থেকে আলাদা করে রেখেছ।

এভাবেই লোকটি তাদের হৃদয়ে কোমলতার উদ্রেক করতে চেষ্টা চালাতে থাকল, চেষ্টা করল তাদের আবেগ ও করুণা জাগিয়ে তুলতে, অবশেষে তারা বলল আমাকে–

তুমি যাও, তোমার স্বামীর কাছে চলে যাও

কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব! 'আব্দুল আসাদ' গোত্রের কাছে মক্কায় আমার কলিজার টুকরা সন্তানকে ফেলে রেখে আমি মদীনায় স্বামীর নিকট কিভাবে যাব!?

কিভাবে আমার মনের জ্বালা মিটবে! কিভাবে আমার অশ্রুধারা থামবে! যদি আমি চলে যাই মদীনায়; আমার ছোট্ট শিশুকে ফেলে মক্কায়, কোন খোঁজ তার না নিয়ে?

কিছু মানুষ বুঝতে পারলেন আমার মর্মবেদনা, অন্তর্জালা। তাদের অন্তর কোমল হল আমার প্রতি, আমার শ্বশুর গোত্রের সঙ্গে আমার ব্যাপারে আলোচনা করল। আমার প্রতি তাদের দয়া ও করুণা হল। তারা ফেরৎ দিলেন আমার কাছে আমার সন্তান সালামাকে।

* * *

মক্কায় আমি আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করলাম না। এমন কি সফরসঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করতেও আমার মন সায় দিল না। আমার আশঙ্কা ছিল, না জানি অকল্পনীয় কোন্ ঘটনা নতুন করে ঘটে, যা স্বামীর সাথে সাক্ষাতের পথে সৃষ্টি করে অন্তরায়!

অবিলম্বে আমার উট তৈরী করলাম, কোলে তুলে নিলাম আমার সন্তানকে। বের হলাম মদীনার পথে আমার স্বামীর উদ্দেশ্যে। আমার সঙ্গে ছিল না এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ।

মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে 'তানঈমে' যখন পৌঁছলাম, সামনে পড়ল উসমান ইবনে তালহা। (তখনো তিনি ছিলেন মুশরিক) তিনি জিজ্ঞাসা করলেন–

–কোথায় যাচ্ছ হে 'যাদুররাকিব' (মুসাফিরের পাথেয়) এর কন্যা?

–যাচ্ছি মদীনায় স্বামীর উদ্দেশ্যে।

–তোমার সঙ্গে কি কেউ নেই?

–না, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। আর আছে আমার এই ছোট্ট মেয়ে।
–আল্লাহর কসম! এভাবে একাকী তোমাকে যেতে দেওয়া সম্ভব নয়, মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।
তিনি আমার উটের লাগাম ধরলেন, আমাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য চলতে শুরু করলেন ...
আল্লাহর কসম! তাঁর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও সম্ভ্রান্ত কোন আরবের সঙ্গ আমি আর কখনো পাইনি।
আমরা যখনই কোন মনজিলে যাত্রা বিরতি করতাম, তিনি আমার উটকে বসাতেন এবং দূরে সরে যেতেন। আমি নেমে দাঁড়ানোর পর ঠিকঠাক হলে তিনি কাছে এসে উটের পিঠ থেকে সামান নামাতেন এরপর উটকে কোন গাছের সঙ্গে বাঁধতেন।
আমার থেকে দূরত্ব রেখে ভিন্ন একটি গাছের ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম নিতেন।
পুনরায় রওনার সময় হলে তিনি আমার উট প্রস্তুত করে আমার কাছে নিয়ে আসতেন। নিজে দূরে সরে গিয়ে বলতেন – উঠে পড়।
আমি উঠে সোজা হয়ে বসার পর তিনি কাছে আসতেন। উটের লাগাম ধরে আবার যাত্রা করতেন।

* * *

প্রতিদিনই তিনি আমার সঙ্গে একই আচরণ করতেন মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত। মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে 'কুবা'র নিকটবর্তী বানূ আমর ইবনে আউফের বসতিতে পৌঁছার পর তিনি বললেন–
–তোমার স্বামী আছেন এই গ্রামেই। তুমি আল্লাহর নামে চলে যাও।
তিনি সেখান থেকেই মক্কার উদ্দেশ্যে ফেরৎ যাত্রা করলেন।

* * *

দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতার পর আবার এল কাঙ্খিত মিলনের ক্ষণ। উম্মে সালামার চক্ষু শীতল হল স্বামীকে দেখে।
আবু সালামা খুশি হলেন স্ত্রী ও সন্তানকে পেয়ে। এরপর চোখের

পলকের মত অতি দ্রুত কেটে গেল সময়। ঘটে গেল অনেক ঘটনা।
এই দেখ 'বদর' প্রান্তর, এই যুদ্ধে হাজির হচ্ছেন আবু সালামা। অন্য মুসলিমদের সঙ্গে ফিরছেন। এখানে তাঁরা স্পষ্ট বিজয় লাভ করেন।
এই দেখো 'ওহোদ'। বদরের পর তিনি প্রবেশ করছেন ওহোদের যুদ্ধের ভিড়ে। এখানে তিনি উত্তম যোদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। কিন্তু 'ওহোদ' প্রান্তর থেকে তিনি ফিরলেন ভয়াবহ, গভীর জখম নিয়ে। অবিরাম সেই জখমের যন্ত্রণায় ভুগতে থাকলেন, অবশেষে মনে হল ঘা সেরে গেল, অথচ ঘা এর ভেতর থেকে পচন ধরেছিল। ফলে শীঘ্রই ঐ স্থান ফুলে গেল যা তাকে করে দিল শয্যাশায়ী।
আবু সালামা যখন জখমের তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, সে সময় একদিন তিনি বললেন স্ত্রীকে, হে উম্মে সালামা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

لا تصيب أحدا مصيبة فيسترجع عند ذلك و يقول "اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيْبَتِيْ هٰذِهٖ، اَللّٰهُمَّ اخْلُفْنِيْ خَيْرًا مِنْهَا" إلا أعطاه الله عز و جل

অর্থ ঃ কারোর কোন মুসিবত হলে সে যদি বলে ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রা-জিউ-ন,
আর বলে–
'হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমার এই মুসিবতের প্রতিদান প্রত্যাশা করি...
হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এরচেয়ে উত্তম বদলা দান কর' তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে সেটা দান করেন।

* * *

আবু সালামা কয়েকদিন পর্যন্ত শয্যাশায়ী থাকলেন। একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে এলেন তাকে। তিনি খোঁজ-খবর নিয়ে ফিরছিলেন, দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন এরই মধ্যে আবু সালামা প্রাণত্যাগ করলেন, ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রা-জিউ-ন।
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র দুই হাতে সাহাবীর

Contents

দুই চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে বললেন– 'হে আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা করে দাও, তাঁর মর্যাদা উঁচু করে দাও তোমার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের মাঝে

তাঁর বদলে তুমি হয়ে যাও তাঁর সন্তান ও বংশের অভিভাবক

তাঁকে ও আমাদের সকলকেই ক্ষমা করে দাও ইয়া রাব্বাল আলামীন

তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দাও, করে দাও জান্নাতী আলোয় আলোকিত

উম্মে সালামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বাণীর কথা স্মরণ করলেন যা তাঁর কাছে বর্ণনা করেছিলেন আবু সালামা। সেটা স্মরণ করে তিনি বললেন– 'হে আল্লাহ! আমার এই মুসিবতের প্রতিদান তোমার কাছে প্রত্যাশা করি

কিন্তু তাঁর ভাল লাগল না ঐ অংশটুকু বলতে যে, 'আমাকে এর চেয়ে উত্তম বদলা দাও' কারণ মনের মধ্যে তাঁর জিজ্ঞাসা জেগে উঠত– আবু সালামার চেয়ে উত্তম আর কে আছে?

কিন্তু মনের মধ্যে দ্বিধা ও জিজ্ঞাসা থাকলেও তিনি অবিলম্বে ঐ দু'আর শেষ অংশও বললেন এবং দু'আটিকে পূর্ণাঙ্গ করলেন

* * *

উম্মে সালামার বিপদে ব্যথিত হলেন মুসলিমগণ। এমন ব্যথিত তাঁরা আর কারোর বিপদেই হননি।

তাঁরা তাঁর নামের সঙ্গে ব্যবহার করলেন 'আরবের বিধবা' নামটি।

কেননা তাঁর আত্মীয়-স্বজন কেউই ছিল না মদীনায়, পাখির ছানার মত ছোট্ট একটি মেয়ে ছাড়া।

* * *

মুহাজির ও আনসার সকলেই অনুভব করলেন যে, উম্মে সালামার জন্য তাদের কিছু করণীয় রয়েছে। তাই আবু সালামার মৃত্যুতে তাঁর শোক পালন (ইদ্দত) সমাপ্ত হতে না হতেই তাঁর দিকে এগিয়ে আসলেন আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু, তিনি প্রস্তাব দিলেন তাঁকে বিবাহের,

সে প্রস্তাব গ্রহণে তিনি অসম্মতি জানালেন

এরপর এগিয়ে আসলেন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু, তিনি তাঁকেও ফেরত দিলেন যেমন ফেরত দিয়েছেন আবু বকরকে

এবার প্রস্তাব দিলেন খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তখন তিনি তাঁকে বললেন–

'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার তিনটি দোষ আছে–

–আমার আত্মসম্মানবোধ খুব তীব্র, আমার আশঙ্কা হয় যে, আমার এই দোষ আপনার সামনে প্রকাশ পাবে যাতে আপনি কষ্ট পাবেন আর সে কারণে আল্লাহ আমাকে শাস্তি দেবেন।

–আমি একজন বয়স্কা নারী, বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে।

–আমার সন্তান রয়েছে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

'তুমি যে আত্মসম্মানবোধের কথা বলেছ, এ বিষয়ে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করব, তিনি এই দোষ মুক্ত করে দেবেন তোমাকে।

যে বয়সের কথা বলেছ, সেটাতো আমার বেলায়ও একই। তোমার যেমন বয়স বেড়েছে আমারও বেড়েছে।

আর তুমি যে সন্তানের আপত্তি তুলেছ, সে বিষয়ে কথা হচ্ছে এই যে, তোমার সন্তান হবে আমারও সন্তান। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করলেন উম্মে সালামাকে। এতে প্রমাণ হল সেই হাদীসের সত্যতা, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা উম্মে সালামার দু'আ কবুল করলেন এবং তাকে আবু সালামার চেয়ে উত্তম বদলা (রাসূলকে) দান করলেন।

সে দিন থেকে হিন্দ আলমাখযূমিয়্যা একা সালামার মা রইলেন না, হয়ে গেলেন সকল মুমিন এর মা (উম্মুল মুমিনীন)।

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের মধ্যে উম্মে সালামার চেহারা উজ্জল ও আলোকিত করুন, রাযিয়াল্লাহু আনহা ওয়া আরযাহা।

সমাপ্ত

Contents

মুসলিম বিশ্বে সাড়া জাগানো অমরগ্রন্থ-

নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন

প্রকাশক রাহনুমা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, দোকান ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
দোকানঃ ০১৯১৫-৪৬২৬০৮, সার্বিক যোগাযোগঃ ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯
০১১৯৭-৩৯৭৩৩৯, ০১৮৩৪-৩৫২০৫৫

প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১২
প্রকাশনা সংখ্যা ৭
প্রচ্ছদ মুহা. মাহ্‌মুদুল ইসলাম

মূল্য ১০০/- (একশত টাকা)

ISBN 978-984-33-3776-4
E-mail rahnumaprokashoni@gmail.com / hotmail.com

NARI SAHABIDER EMANDEEPTO JIBON
Writer: D. Abdur Rahman Rafat Pasha, by:Mawlana Masudur Rahman
Price Tk. 100.00, US $ 5.00 only.

নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন

'নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন' মুসলিম বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী আরবী গ্রন্থ 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবিয়্যাত' এর অনূদিত গ্রন্থ। বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার, সুপণ্ডিত ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা উপস্থাপন করেছেন আটজন নারী সাহাবীর আলোকিত জীবন। নবীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এই নারীদের অসাধারণ ত্যাগ ও কুরবানীর হৃদয়ছোঁয়া কাহিনী সাহিত্যের রস আর অলঙ্কারের সৌন্দর্য মিশিয়ে বিবৃত হয়েছে এ গ্রন্থে। লেখকের ঈমানজাগানো ভাষা ও অনন্যশৈলীতে রচিত 'নারী সাহবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন' একটি অসাধারণ গ্রন্থ স্বীকার করতেই হবে।

যদিও নবীজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নারীদের অনেকের জীবনী বাজারে পাওয়া যায়। তবে ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশার মন মাতানো এমন রচনার নজির একেবারেই দুস্প্রাপ্য। সে কারণেই জীবনীগুলো কেউ পূর্বে পাঠ করে থাকলেও তার মনে হবে যেন এই প্রথম পড়ছি।

তাঁর রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য এই যে, চমৎকার রচনাগুলো পাঠ করতে করতে লেখক সম্পর্কে নির্মোহ থাকা যায় না। পাঠক হন লেখকের ভক্ত। ভক্তির সিঁড়ি বেয়ে এক সময় তিনি হয়ে পড়েন লেখকের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গী। পাঠককে একাকার হতে হয় পঠিত বিষয়ের সঙ্গে। ফলে তিনি হন কখনো পুলকিত, কখনো শিহরিত। কখনো তাঁর দু'চোখ হয়ে পড়ে অশ্রুপ্লাবিত।

ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশার এমন পাঠক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর যিনি পড়েন অথচ বারবার চোখ ভেজেনা। অশ্রু ঝরে না।

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, দোকান ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।